THE ray

PRIME UNIVERSITY MAGAZINE 2018

PRIME UNIVERSITY

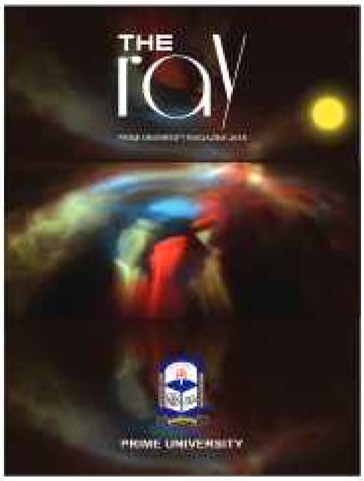

THE RAY

3rd Issue 2018

Prime University

114/116, Mazar Road, Mirpur-1, Dhaka-1216

EDITTORIAL BOARD

Advisors:

Mir Shahabuddin, Chairman, Board of Trustees
Md Anwer Hossain Khan, Member, Board of Trustees
Asia Zaman (Rita Zaman), Member, Board of Trustees

Editor:

Md Nur Hossain Talukder
Controller of Examinations
Ex-Director General of Family Planning & Rtd. Additional Secretary

Co-Editors:

Mahboob Ul Alam, Professor, Department of Education
Rakib Uddin, Assistant Professor, Department of English

Members:

Nahid Farzana, Associate Professor, Department of Business Administration
Eman Hossain, Associate Professor, Department of Business Administration
Shuvodip Das, Assistant Professor, Department of EEE
Aysha Alam Talukder, Assistant Professor, Department of English
Md Ashrafuzzaman, Assistant Professor, Department of Education
Sayed Mohammad Rezwanul Islam, Lecturer, Department of Law
F Nahid Huq, Deputy Director, Centre for Research, HRD and Publications

CHAIRMAN
BOARD OF TRUSTEES

MESSAGE

It gives me immense pleasure to know that the 3rd issue of The Prime University Magazine is going to be published soon. Though the publication of the magazine by the University is a recent phenomenon, I am highly impressed to note that the first two issues have been of a high quality to come up to my expectation. I believe the 3rd issue will be more befitting than the past ones by way of publishing compositions from the renowned writers as well as from the new writers, particularly the students and faculty members of the University.

I also hope that the 3rd issue containing quality writings and impressive get-up will reach the readers by the end of this year. Incidentally I would like to congratulate the Magazine Committee who has done a laudable job with a profound sense of responsibility and devotion.

I wish the 3rd issue of 'The Ray' will surely earn joyful appreciation of the readers.

Mir Shahabuddin

Mir Shahabuddin

VICE CHANCELLOR

MESSAGE

I feel proud to see the third issue of 'The Ray', the annual magazine of Prime University published.

Knowledge is a liberating force and it is metamorphosised into a regulating strength, cutting across the barriers of prejudice and ignorance, smoothing out the various disparities between human beings. Knowledge has also come a long way as a powerful vision. Our university presents a nice blending of various branches of education where knowledge is imparted to the students so that they may occupy a better place in the modern competitive world and improve all round personalities retaining the beauty of mind and intellect as well as of soul. I feel proud of its alumni, students, faculties, executives and staff who are paying additional attention in contributing to the magazine of the university.

The third issue of the magazine exposes the spirited desire of our learners to reach out the limits of their learning and attain something for inner satisfaction besides monotonous academic studies. Besides academic excellence of our learners need to be involved in the process of creative and critical thinking for their holistic development as a moral human being. This magazine is such a podium for that cultivation as a regular practice.

I would like to admire the editor, all other executive members of editorial body, sponsors, teachers, writers, staff and students for their strong sense of commitment, service and responsibility those have been transformed as a successful outcome of this magazine.

I wish, the third issue of 'The Ray' of Prime University will achieve greater success and scaling new heights in future.

Md Abdus Sobhan

Prof Dr M Abdus Sobhan

EDITORIAL

Following each year 'The Ray' is going to be brought to light for the readers. This is the third publication of the magazine. The figure 3rd or what we say 3 is a prime or a lucky one as if the world is for those who have got third eye. Likewise, there is an interesting game with the digit 3 as we see in Mathematics that 3 and 3 makes 6 and again 3 times 2 is equivalent to 6! So, there is nothing to squander away, not withstanding, it is not surprising to be trapped in dilemma if you reverse. This present volume has been enriched with the creations made by a galaxy of the novice and the old. In quest of knowledge, students and teachers will have ample scope to peek inside the writings of the renowned scholars, poets and writers. In the same vein, beginners will get motivated in creating innovative trend in writing as motivation does much to innovation.

In due course Mir Shahabuddin, Chairman of the Board of Trustees has been bestowed with a lot of thanks and gratitude for giving us the valuable suggestions in this regard and we really feel honored to have his excellent piece of self-esteemed poem from him. Besides, a renowned scholar and researcher, Prof Dr M Abdus Sobhan, Vice Chancellor of our university, has written an article about High-tech, which will help the students a lot. We are giving him our heartfelt gratitude. To the last, I am extending my thanks to the concerned, who made this endeavor successful.

Still in digitalization, digital ghost may exist in the press! So, disregarding our unwilling slip-ups, you are cordially expected to give your valuable advice and comments for further improvement of our work. Thanks to all.

N. H. Talukder.

Md Nur Hossain Talukder

CONTENTS

প্রবন্ধ

প্রফেসর ড. এম. আব্দুস সোবহান : হাই-টেক পার্ক ১৩
যতীন সরকার : মহাকবি রবীন্দ্রনাথঃ তাঁর মহাকাব্য ১৬
ড. আতিউর রহমান : 'নিশিদিন ভরসা রাখিস' রবীন্দ্রভাবনায় সমাজ ও শিক্ষা ২৫
Professor Dr Jahangir Alam : Nano Materials–What These Are and Their Applications ৩২
মো: আশরাফুজ্জামান : তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) শিক্ষা: বাস্তবতা ও পথ নির্দেশনা ৩৫
Alaul Alam : Fakir Lalon Shah's Philosophy of Religion : An introspection from his famous songs ৩৮
আনোয়ার হোসেন : প্রাইম ইউনিভার্সিটি প্রাইম কেন? ৪২
Dr Yeasmin Jahan : Women's Share in Property and Wealth and its Impacts on Their Rights and Health in Bangladesh ৪৮
এ্যাডভোকেট মায়ারানী দেব ভৌমিক : মাদকাসক্তি জাতীয় উন্নয়নে বড় বাধা ৫২
শাহরিয়ার হোসেন ইমু : কালো সাদার বৈষম্য ৫৪
মোঃ মিজানুর রহমান : বাঁশরীর আর্তনাদ ৫৫

গল্প

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : অদৃশ্যযাত্রা ৫৯
আনিসুল হক : অগল্প ৬৭
শরীফ খান : প্রাণীদের মজার কাণ্ড ৭২
Md Abdul Awal : The Tale of Tall Talks ৭৮
রেজিয়া খানম : ভালো মেয়েটি ৮১
Azmain-ar-Rafi (Omi) : The Trick of Loan ৮৩
নূর মোহাম্মদ আরিফ : কালো মেঘে একটু রংধনু ৮৫
সবুজ খান : জীবনের গল্প ৮৭

কবিতা (ফিরে দেখা)

কাজী নজরুল ইসলাম : মোহররম ৯০
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : দূরের পাল্লা ৯৩

সুকুমার রায়	:	জীবনের হিসাব	৯৪
সুনির্মল বসু	:	সবার আমি ছাত্র	৯৫
শামসুর রাহমান	:	অভিশাপ দিচ্ছি	৯৬
সুকান্ত ভট্টাচার্য	:	ছাড়পত্র	৯৮
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	:	ফুল ফুটুক না ফুটুক	৯৯
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	:	আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি	১০০
হোসনে আরা	:	সফদার ডাক্তার	১০২
হুমায়ূন আজাদ	:	আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর জন্যে	১০৩

কবিতা

নির্মলেন্দু গুণ	:	কাব্য সুন্দরী	১০৫
মহাদেব সাহা	:	কাব্যের ভবিষ্যৎ	১০৬
রবিউল হুসাইন	:	উনভাব অপরাধ	১০৭
আবিদ আনোয়ার	:	সহজ সুন্দরী	১০৮
হাবীবুল্লাহ সিরাজী	:	জট তবু গিঁট	১০৯
মারজুক রাসেল	:	চাবুকের নৌকা	১১০
মুজিব ইরম	:	অনুরাগ	১১০
মুহাম্মদ নূরুল হুদা	:	সার্বভৌম খামার	১১১
নাসির আহমেদ	:	একটি চিত্রকর্মের জন্য	১১২
সৈয়দ শফিউল ইসলাম	:	পান্থশালা	১১৩
মীর শাহাবুদ্দিন	:	আমার দেশ বাংলাদেশ	১১৪
মোঃ ওয়াহিদুর রহমান	:	সজাগ হয়ে যাও	১১৫
প্রফেসর ড. আবদুর রহমান	:	বিপন্ন মানবতা	১১৬
Professor Mahboob Ul Alam	:	Trees Turn Trimming	১১৭
মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন খান	:	খোকা থেকে জাতির জনক	১১৯
ড. আবু তাহের	:	বিজয় তুমি	১২০
মোঃ জসীম উদ্দীন সীমান্ত	:	শেষ ভাবনা	১২১
স্বরূপ রায়	:	আমি আমার হতে চাই	১২২
মোঃ শামীমুর ইসলাম	:	স্বপ্নময় প্রাইম ইউনিভার্সিটি	১২৩
সাব্বির আহমেদ	:	বাস্তব জীবন	১২৪
হাসান মোহাম্মদ শরিফুল হক	:	তুরাগ নদী	১২৫
মোঃ শামসুল আকরাম	:	স্বার্থপর	১২৬
Md Farhan Abid Eham	:	Unpaid Intern	১২৭
রাজু আহমেদ	:	সংগ্রাম	১২৮
হাফিজুর রহমান	:	মনোবল	১২৯
কাজি মাহামুদুল হাসান	:	নির্মমতা	১৩০
মোঃ আতাউর রহমান তুরাক	:	আমার মা	১৩১
মোঃ আব্দুল মোহাইমিন	:	বসন্তের রঙ ঢং	১৩২
ফারহানা জেবিন রিতু	:	অন্তর্জাল	১৩৩
আশরাফ মন্ডল	:	আমার চাঁদ	১৩৪
মিফতাহুল জান্নাত মিষ্টি	:	মা	১৩৫

স্মৃতিচারণমূলক রচনা

ফরিদুর রেজা সাগর :	অদ্ভুত এক কান্ড	১৩৭
জসীম মাহমুদ :	স্মৃতির পাতা থেকে	১৪১
নাজনীন জামান :	একজন শিক্ষকের অভিজ্ঞতা	১৪২
মীর আহমেদ হুসাইন (হাসান) :	আমার স্মৃতিতে একজন বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাঃ প্রেক্ষাপট	১৪৪

রম্য রচনা

কাজী তৌহিদ ইলাহী :	বাবু স্যার বিএড, এমএড	১৪৬

সিনেমা রিভিউ

Nazmul Hassan :	His Judgement Cometh and Right Soon...	১৪৮

ভ্রমণ কাহিনী

মোঃ খালিদ হুসাইন :	আমরা চার জন	১৫১

সচেতনতামূলক রচনা

এফ নাহিদ হক :	জোছনা হারিয়ে যাচ্ছে ...	১৫৪
Banani Afrin :	Beat Plastic Pollution	১৫৬

Photo Gallery ১৫৯

প্রবন্ধ

প্রফেসর ড. এম আব্দুস সোবহান	:	হাই-টেক পার্ক
যতীন সরকার	:	মহাকবি রবীন্দ্রনাথঃ তাঁর মহাকাব্য
ড. আতিউর রহমান	:	'নিশিদিন ভরসা রাখিস' রবীন্দ্র ভাবনায় সমাজ ও শিক্ষা
Professor Dr Jahangir Alam	:	Nano Materials –What These Are and Their Applications
মো: আশরাফুজ্জামান	:	তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) শিক্ষা: বাস্তবতা ও পথ নির্দেশনা
Alaul Alam	:	Fakir Lalon Shah's
Philosophy of Religion	:	An introspection from his famous songs
আনোয়ার হোসেন	:	প্রাইম ইউনিভার্সিটি প্রাইম কেন?
Dr Yeasmin Jahan	:	Women's Share in Property and Wealth and its Impacts on Their Rights and Health in Bangladesh
এ্যাডভোকেট মায়ারানী দেব ভৌমিক	:	মাদকাসক্তি জাতীয় উন্নয়নে বড় বাঁধা
শাহরিয়ার হোসেন ইমু	:	কালো সাদার বৈষম্য
মোঃ মিজানুর রহমান	:	বাঁশরীর আর্তনাদ

হাই-টেক পার্ক

প্রফেসর ড. এম. আবদুস সোবহান
উপাচার্য, প্রাইম ইউনিভার্সিটি

ভূমিকা

১৯৯৭ সালে রফতানী সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের ১৮তম সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ থেকে সফটওয়্যার রফতানীর সমস্যা ও সমাধানের উপর সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য ১০-সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের প্রফেসর ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী বর্তমানে জাতীয় অধ্যাপক। এই প্রবন্ধের লেখক ঐ কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৯৯৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। কমিটি ৪৩ (তেতাল্লিশটি) সুপারিশের উল্লেখ করেন। সুপারিশগুলি ছিলঃ আর্থিক (Fiscal), মানবসম্পদ উন্নয়ন (Human Resource Development), অবকাঠামো উন্নয়ন (Infrastructure development) এবং মার্কেটিং (Marketing) সংক্রান্ত ৪ টি খাতের উপর। অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক ১১ নং সুপারিশটি ছিলো টঙ্গি আশুলিয়ার কাছে সর্বপ্রকার সুবিধাসহ একটি Information Technology Village (ITV) বা High-Tech Park সৃষ্টি করার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খসড়া সুপারিশমালা প্রণয়নে কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন এই প্রবন্ধের লেখক।

হাই-টেকনোলজী বা হাই-টেক কি ?

হাই-টেকনোলজী (high technology) বা হাই-টেক (hi-tech) এর যথাযথ সংজ্ঞা দেয়া খুব সহজসাধ্য নয়। হাই-টেক এমন একটি প্রযুক্তি যাকে কাটিং এজ প্রযুক্তি যা এই সময়ের সর্বোচ্চতম ব্যবহারোপযোগী প্রযুক্তি। কাটিং এজ প্রযুক্তি হচ্ছে স্টেট অব দি আর্ট প্রযুক্তি। স্টেট অব দি আর্ট বলতে বিজ্ঞান, কৌশল বা প্রযুক্তির একটি নির্দিষ্ট সময়ের সর্বোচ্চতম স্তরের সার্বিক উন্নয়ন বুঝায়। যেমন - ইন্টারনেট, কম্পিউটারের ভিতরে ব্যবহৃত প্রসেসর উৎপাদন, ইন্টারনেট অব থিংস (আই.ও.টি বা IOT), কৃত্রিম উপগ্রহ, রকেট প্রযুক্তি, রোবটিক্স ইত্যাদি সবই হাই-টেক প্রযুক্তির উদাহরণ। পাট মিলে চট তৈরী একটি নিম্ন প্রযুক্তি, স্লাইড রুলের সাহায্যে গণনা করা নিম্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের উদাহরণ।

হাই-টেক পার্ক কি?

আন্তর্জাতিক সায়েন্সপার্ক এ্যাসোসিয়েশনের মতানুযায়ী হাই-টেক পার্ক হচ্ছে এমন একটি টেক-পার্ক যেখানে নিম্নলিখিত বৈশিষ্টসমূহ বিদ্যমান ঃ

(ক) এটি একটি সম্পদ ভিত্তিক উদ্যোগ যেখানে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলি যথা- বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য উচ্চ শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীসমূহ এবং গবেষণা কেন্দ্র সমূহের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক (formal) এবং কার্যকরী (operational) সংযোগ থাকবে।
(খ) এখানে স্থানিক ভাবে (on site) জ্ঞানভিত্তিক শিল্পকারখানা এবং উচ্চ মূল্য সংযোজনকারী (High Value Added) কারখানা স্থাপনে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করা হবে।
(গ) একটি দক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিষদ সার্বক্ষণিকভাবে এখানে অবস্থানরত সুবিধা ভোগকারী (tenant) সংস্থাগুলিকে প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সর্বদা উৎসাহ প্রদান এবং সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা প্রদান করবে।
(ঘ) তাছাড়াও এই ব্যবস্থাপনা পরিষদ এই পার্কের আর্থিক, মানব সম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবর্ধন (expansion), মার্কেটিং (marketing) বিষয়ক কর্মকান্ডে সর্বোতভাবে tenant

দের সহযোগিতা করবে।

হাই-টেক পার্কের ৬টি মূল স্তম্ভ হচ্ছে

১) প্রযুক্তি (Technology) ২) উদ্ভাবন (Innovation) ৩) বিশ্ববিদ্যালয় (University)
৪) বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প-সহযোগিতা (University-Industry-Collaboration)
৫) শিল্পোদ্যোগ (Entrepreneurship) এবং ৬) ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ (Venture Capital)

হাই-টেক পার্কের কার্যক্রম

সাধারণতঃ ইলেকট্রনিক ডিভাইস প্রযুক্তিকে উচ্চ-প্রযুক্তি বলা হয়। এই প্রযুক্তির সাহায্যে মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স, সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস ফেব্রিকেশন, ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরীকরণ, ইনস্ট্রুমেন্টেশন, রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি এবং মাইক্রোওয়েভ কৌশলাদি (devices), মিলিমিটার ওয়েভ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, অপটিক্যাল ও আপটো-ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, তথ্য ও ডিজিটাল যোগাযোগ, আলট্রাসনোগ্রাফিক, ম্যাগনেটি রেজোন্যানস্ ইমেজিং (MRI) এবং কম্পিউটার টমোগ্রাফি (CT) ইমেজিং সম্পন্ন করা হয়। অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

- পণ্য উন্নয়নের জন্য তৈরী ল্যাবরেটরীর পরীক্ষা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি তৈরী করা।
- মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের ক্ষতিসংক্রান্ত যে কোন ঝুঁকি কিংবা পরিবেশ দূষণ সনাক্তকরণ অথবা সংরক্ষণ প্রযুক্তি, দূষণ অবনমণ প্রযুক্তি কিংবা অন্যতর এনার্জি সোর্সের অনুসন্ধান প্রযুক্তি;
- উচ্চ প্রযুক্তির সাহায্যে অত্যাধুনিক মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি, যেমন Color Doppler Echocardiography অথবা ঔষধ জাতীয় পণ্যাদি যার চিকিৎসাজনিত (therapeutic) বা অসুখ নির্ণয় সংক্রন্ত (diagnostic) বিষয়ক খাতে মূল্য সংযোজন (value addition) হয় ;
- পণ্য গবেষণা ও উন্নয়ন ;

উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অত্যাধুনিক ইলেকট্রিক যানবাহন তৈরী করা (যেমন ম্যাগনেটিক ও বুলেট ট্রেন) চালকবিহীন কার (car), বিদ্যুৎ এবং পেট্রোল এর যৌথ ব্যবহারযুক্ত গাড়ী অথবা বিকল্প জ্বালানী ব্যবহৃত গাড়ী যেমন সম্ভাব্য হাইড্রোজেন জ্বালানী চালিত গাড়ী ইত্যাদি।

হাই-টেক পার্কের ইতিহাস

১৭৬৯ সালে আমেরিকার সানফ্রানসিসকো উপসাগর আবিষ্কার করেন স্প্যানিশ সৈনিক ও আবিষ্কারক গ্যাসপার দ্যা পোরটলা। ১৮৪৬ সালে ঐ এলাকায় বাসকরতো মাত্র ১০০ জন ওহলোন ভারতীয় এবং ১০০ জন মেক্সিক্যান। ধীরে ধীরে ১৮৫২ সালে এই এলাকার ছোট্ট বসতটি ৩৬,০০০ জনের এক শহরে পরিণত হয়ে গেল। কেন - কি ঘটেছিলো? ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির বার্কলে ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠিত হলো এই উপসাগরের ধারে এবং অদূরেই ১৮৯১ সালে লেল্যান্ড স্ট্যানফোর্ড প্রতিষ্ঠা করলেন পূর্ণাঙ্গ স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি। তখন এখানে চলছিলো স্বর্ন হিড়িক বা gold rush। স্ট্যানফোর্ড স্বর্ন ব্যবসা করে একজন শীর্ষ ধনী ব্যক্তি হয়ে গেলেন এবং ১৮৬১ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার গর্ভনর নির্বাচিত হলেন। পরবর্তীতে তিনি আরো অনেক উপরে উঠেছেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র স্ট্যানফোর্ড Junior এর মৃত্যুতে শোকাভিভূত হয়ে তিনি ১৮৮৫ সালের ৯ই মার্চ স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির নাম প্রস্তাব করেন। ঐ সময়ে তিনি Stanford University এর endowment ফান্ডে USD 40 million প্রদান করেন।

রাল্ফ ভার্স্ট নামক একজন উদ্যোক্তা সিলিকন ভ্যালী শব্দ দুটির প্রথম ব্যবহারকারী। ভার্স্টের বন্ধু ডন হোয়েফলার সিলিকন ভ্যালী শীর্ষক একটি সাপ্তাহিক বাণিজ্য বিষয়ক ইলেকট্রনিক্স পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তারপর শব্দ দুটি পরিচিতি পায় এবং ধীরে ধীরে ১৯৮০ সালের মধ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ইতোমধ্যে IBM পিসি এবং বিভিন্ন প্রকার হার্ডওয়্যার ও সফ্‌টওয়্যার পণ্য বাজারে এসে যায়।

প্রথমত সিলিকন নামটি এসেছে বেশীরভাগ কোম্পানী তাদের ইলেক্ট্রনিক পণ্য তৈরীতে সেমিকন্ডাক্টর ব্যবহার করতো যা সিলিকন ভিত্তিক ছিল। প্রায় সকল কম্পিউটার শিল্পে ব্যাপক ভাবে সিলিকন ব্যবহৃত হতে থাকলো। সিলিকনভ্যালীর স্থপতি হিসেবে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির স্থপতি লেল্যান্ড স্ট্যান্ডফোর্ড এবং স্ট্যান্ডফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডঃ ফ্রেডরিক টারম্যানের নাম উল্লেখ করতেই হয়। ফ্রেডরিক টারম্যানের সাথে সাথে উইলিয়াম শকলির নাম ও উল্লেখ্য যোগ্য। ১৯৫৬ সালে শাকলি সেমিকন্ডাকটর নামক কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন পরবর্তীতে বিশিষ্ট আটজন সহযোগী তাঁর কোম্পানী ছেড়ে চলে গিয়ে ফেয়ারচাইল্ড সেমিকন্ডাক্টর নামক কোম্পানী তৈরী করেন যা ছিল প্রথম শিল্পোদ্যাগ কোম্পানী বা স্টার্ট-আপ কোম্পানী।

প্রফেসর ফ্রেডরিক ট্যারম্যানের উপদেশ এবং উদ্যোগে সদ্য পাশ করা তাঁর দুই ছাত্র বিল হিউলেট এবং ডেভিড প্যাকার্ড তাদের হিউলেট-প্যাকার্ড বা এইচ.পি কোম্পানী স্থাপন করেন সিলিকন ভ্যালীতে। প্রফেসর টারম্যান ব্যক্তিগতভাবেও এই কোম্পানীতে বিনিয়োগ করেন।

১৯৫১ সালে স্থাপিত হয় স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ পার্ক যেখানে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি তার বেশ কিছু জমি লীজ দেয়। তারপর এই পার্ক ঘিরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে সিলিকন ভ্যালী হিসেবে।

গর্ডন মুর এবং রবার্ট নয়েস পরবর্তীতে ফেয়ার-চাইল্ড ছেড়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন ইনটেল (Intel) নামক আর এক স্টার্ট-আপ। সিলিকন ভ্যালী ছাড়াও সারা পৃথিবী জুড়ে প্রায় সাত-আটশত হাই-টেক পার্ক সৃষ্টি হয়েছে- যার বেশীর ভাগই অবস্থিত আমেরিকা, চীন, ভিয়েতনাম, ভারত, ইসরায়েল, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ইংল্যান্ড, জাপান, বুলগেরিয়া, বাংলাদেশ ইত্যাদি দেশসমূহে।

বাংলাদেশে হাই-টেক পার্ক স্থাপন

ভূমিকায় বর্ণিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার গাজীপুরের আশুলিয়া সড়ক সংলগ্ন ৩৫৫ একর জমির উপর বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক ছাড়াও আরও কিছু হাই-টেক পার্ক-এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকাস্থ কাওরান বাজারে জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোরে শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, রাজশাহী বঙ্গবন্ধু সিলিকন সিটি, সিলেট ইলেকট্রনিক্স সিটি, খুলনা হাই-টেক পার্ক, চট্টগ্রাম হাই-টেক পার্ক উল্লেখ্য যোগ্য।

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক হতে ইতিমধ্যে ড্যাটাসফট কোম্পানী লিমিটেড জাপান, সৌদি আরব এবং আফ্রিকা মহাদেশের কিছু দেশে আই-ও-টি কৌশলাদি রপ্তানী করছে। ২রা অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে সৌদি আরবে এই রপ্তানীকাজ শুরু হয়েছে। জাপান সরকার ১০,০০০ স্মার্ট হাউজ তৈরী করবে টোকিও শহরে। এজন্য এখানে আই-ও-টি ডিভাইস প্রয়োজন হচ্ছে। সৌদি আরব আরো ৫,০০০ সংখ্যক এ জাতীয় কৌশলাদি আমদানী করবে। মক্কার বিভিন্ন বাড়ীতে অবস্থিত পানির ট্যাঙ্ক গুলি এই আই-ও-টি দ্বারা সংযুক্ত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেখানে পানি সরবরাহ সার্বক্ষনিক বিশ্বস্তভাবে নিশ্চিত হবে। মক্কা শরীফে কেন্দ্রীয়ভাবে পানি সরবরাহ পদ্ধতি চালু নাই। প্রতিবাড়ীতে পৃথক পৃথক ট্যাঙ্কগুলি পানি ভর্তি ট্রাক এসে হোস পাইপের সাহায্যে ভর্তি করে দিয়ে যায়। প্রতিটি আই-ও-টির মূল্য ৫০০ USD। ড্যাটাসফট কোটি টাকার উপরে এই ডিভাইস রপ্তানী করছে।

পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল বাংলাদেশে কয়েকশত হাই-টেক পার্ক স্থাপিত হবে বলে এই প্রবন্ধের লেখক বিশ্বাস করে। অচিরেই বাংলাদেশ হবে শিল্প সমৃদ্ধ একটি উন্নত দেশ। এজন্য আমাদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে তৈরী করতে হবে বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যবসা-প্রশাসন, আইন ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাজার হাজার মানসম্পন্ন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী জ্ঞান-কর্মী যারা এই সব হাই-টেক পার্কে জ্ঞান-কর্মী হিসেবে কাজ করবে।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথঃ তাঁর মহাকাব্য

যতীন সরকার

দুনিয়াজুড়ে যাঁর কবিখ্যাতি, যাঁকে আমরা 'কবিগুরু' ও 'বিশ্বকবি' বলে অভিহিত করি, সেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা 'মহাকবি'ও বলতে পারি নাকি? হ্যাঁ 'মহানকবি'-এই অর্থে তাঁকে মহাকবি বললে কোনো মহল থেকেই আপত্তি উঠবে না। কিন্তু মহাকাব্যের রচয়িতারূপে রবীন্দ্রনাথ একজন মহাকবি ছিলেন - এমন কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না। কারণ আমরা তো সবাই জানি যে, তিনি কোনো মহাকাব্য রচনা করেননি। অন্তত সাহিত্যশাস্ত্রীরা মহাকাব্যের যে সংজ্ঞা ও প্রকরণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাতে তো রবীন্দ্রনাথকে মহাকাব্য রচয়িতারূপে কোনো মতেই চিহ্নিত করা যায় না। তাছাড়া মহাকাব্যের যুগ যে অনেক আগেই অবস্থিত হয়ে গেছে-সে কথাও সর্বজনস্বীকৃত।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই তো জানিয়েছেন-
আমি নাব্ব মহাকাব্য/সংরচনে/ছিল মনে/ঠেকল কখন তোমার কাঁকন
কিংকিনীতে/কল্পনাটি গেল ফাটি/হাজার গীতে।
মহাকাব্যে সেই অভাব্য/দুর্ঘটনায়/পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।
এরপরও আমি বলি, 'মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায়'ও রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে যায়নি, বরং তাঁর পায়ের কাছে কণায় কণায় ছড়িয়ে থেকেও কালক্রমে সবগুলো কণা একত্র জড়িয়ে গিয়ে এমন অভূতপূর্ব ও অচিন্তিতপূর্ব মহাকাব্যের জন্ম দিয়েছে, যে-রকম মহাকাব্যের কথা সাহিত্যশাস্ত্রীরা কল্পনাও করতে পারেননি। বলা যায়, মহান কবি রবীন্দ্রনাথের হাত থেকেই একটি অসাধারণ মহাকাব্য আমরা পেয়ে গেছি। তবে সেই মহাকাব্যের নামটি এখনই বলতে চাই না।

২. বিশ্বের সাহিত্য-অঙ্গনে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সম্ভারের প্রকৃত স্থানটি কোথায়, সে সম্পর্কে পরম বিদ্বান, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতের প্রতি সুধী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সুনীতিকুমার লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের (এবং ভারতীয় সাহিত্যেরও) মধ্যমণি, এবং বিশ্বসাহিত্যের দরবারেও আসন উচ্চতম শ্রেণীতে। আমার ধারণা, সর্বজাতির মানবের সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্ভার দশগ্রস্থ গ্রন্থে বিদ্যমান এবং রবীন্দ্ররচনাবলী এই দশগ্রস্থ গ্রন্থসম্ভারের মধ্যে অন্যতম।'

সুনীতিকুমারের মতে এই দশগ্রন্থ গ্রন্থ হলো-(১) ভারতের সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ মহাভারত ও রামায়ন; (২) প্রাচীন গ্রীসের দুই মহাকাব্য ইলিয়াড ও ওদিসি এবং তিনজন গ্রীক নাট্যকারের (আয়সখুলস, সফোক্লিস ও এউরিপিদেশ-এর) রচিত ট্রাজিক নাটকাবলী; (৩) হিব্রু ভাষায় রচিত য়িহুদি জাতির পুরাণ ইতিহাস ও আধ্যাত্মিক শাস্ত্রগ্রন্থ বাইবেল; (৪) আরবি ভাষায় 'আরব্য রজনী'; (৫) প্রাচীন ওয়েলস, ইংরেজি ও ফরাসিতে রচিত ব্রিটেনের রাজা আর্থারের

রমন্যাস কাহিনী; (৬) ইরানের রাষ্ট্রীয় মহাকাব্য ফিরদৌসী কর্তৃক ফারসি ভাষায় রচিত 'শাহনামা' ; (৭) উইলিয়ম শেক্সপীয়রের রচিত ইংরেজি নাটকাবলী; (৮) গোটের জার্মান ভাষায় রচিত কাব্যনাটক ও গদ্য রচনাবলী; (৯) রুশ ঔপন্যাসিক ও মনীষী লেভ তলস্তয়-রচিত উপন্যাস ও অন্যগ্রন্থ (১০) বাঙ্গালায় ও ইংরেজিতে রচিত রবীন্দ্র-রচনাসম্ভার।

এই নামগুলোর উল্লেখের পরই সুনীতিকুমারের মন্তব্য 'পৃথিবীর সব দেশের অনুভবী সুধীজনের কাছে এই দশগ্রন্থ রচনাবলরি একটি গভীর আবেদন আছে - এই সব বইয়ের কোনোটি না কোনোটি আংশিকভাবে বা পুরোপুরি মানুষের জীবনের আশ্রয় হইয়া দাঁড়াইছে।'

[সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-'সাংস্কৃতিকী' তৃতীয় খন্ড (কলকাতা ১৯৮২) পৃষ্ঠা-১৪৩]
আচার্য সুনীতিকুমারের বক্তব্যের আলোকেই আমরা রবীন্দ্রনাথের মহাকবিরত্বের স্বরূপ অবলোকন করতে পারি। কী করে তিনি মহাকবি হলেন, সেটি বুঝে নিতে পারলেই তিনি কোনো মহাকাব্য রচনা করেছেন কী না তারও খোঁজ নেওয়ায় প্রবৃত্ত হতে পারি।

৩. রবীন্দ্রনাথ শুধু কাব্যই রচনা করেননি, কীভাবে মানুষ তার প্রাত্যাহিক ব্যবহারের ভাষাকে কাব্যে উন্নীত করে, কোন প্রেরণা কাব্যসৃষ্টির মূলে সক্রিয় থাকে, কী কী বৈশিষ্ট্য ধারণ করে মানুষের সাধারণ কথা অসাধারণ কাব্য হয়ে ওঠে, কাব্য কেমন করে মহাকাব্যের পরিণতি লাভ করে - এ রকম সব কিছুরই সুলুক সন্ধানও করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে নিজের কাব্যের ভেতর মহলের অনেক কিছুই পাঠকের কাছে অনাবৃত করে দিয়েছেন; এবং এভাবে তিনি নিজেই হয়ে উঠেছেন নিজের সৃষ্টির ভাষ্যকার। সুনীতিকুমার যে দশগ্রন্থ গ্রন্থকে 'সর্বজাতির মানবের সৃষ্টি সাহিত্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্ভার'রূপে চিহ্নিত করেছিলেন, তার প্রথমেই আছে-'ভারতের সংস্কত ভাষায় নিবন্ধ মহাভারত ও রামায়ণ'। এই মহাভারত ও রামায়ণের মধ্যেই তো নিহিত ভারতীয় সকল কাব্যসাহিত্যের মূল উপকরণ ও উপাদান। বানভট্ট বা ভবভূমি বা কালিদাস - এ রকম সকল সংস্কৃত কবিই রামায়ণ ও মহাভারত থেকে তাঁদের কাব্যের উপাদান গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালের বাংলাসহ সকল নব্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রধান প্রধান কবিগণও রামায়ণ-মহাভারতের ঐতিহ্যের ধারা বহন করেছেন। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় যে 'আধুনিক' সাহিত্যের পত্তন ও প্রতিষ্ঠা ঘটে, তারও মর্মমূলে সক্রিয় থাকে রামায়ণ-মহাভারত পুরাণের পুনর্জন্ম-ঘটানোর প্রয়াস। বিদ্যাসাগর-শ্রীমধুসূদনের হাতেই তার সূচনা এবং রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-বুদ্ধদেব বসুতে তার ক্রমপরিণতি। সুনীতিকুমার যে বিশ্বসাহিত্যের আরও নয়গ্রন্থ গ্রন্থের কথা বলেছেন সেগুলোর ঐতিহ্যও বাংলায় প্রবিষ্ট ও প্রবাহিত হয়েছে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত ভাষায় নিবন্ধ রামায়ণ মহাভারতের সূত্র ধরেই।

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য রামায়ণ-রচয়িতা বাল্মীকিকে বলা হয়েছে 'আদিকবি'। বাল্মীকির প্রতি রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শুধু 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকেই নয়, নানা প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের রচনায় বাল্মীকি ও তাঁর রামায়ণের কথা উঠে এসেছে। এই সূত্রে 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

আদিকবি ও মহাকবি বাল্মীকির কবিত্বলাভের কাহিনীর মর্মকথাটিই রবীন্দ্রনাথ 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় তুলে এনেছেন। এই কবিতায় পৌরাণিক পটভূমিতে আছে 'একদিন বাল্মীকি ভরদ্বাজসহ তমসার তীরে ভ্রমণরত অবস্থায় অকস্মাৎ দেখেন যে, বনমধ্যে কামক্রীড়ারত ক্রৌঞ্চমিথুনের ক্রৌঞ্চকে জনৈক ব্যাধ শরাঘাতে বধ করলে ক্রৌঞ্চী করুণসুরে বিলাপ করতে

থাকে। এই দৃশ্য দেখে শোকাভিভূত বাল্মীকির মুখ হতে একটি শ্লোক নির্গত হয়। শ্লোকটি হচ্ছে: 'মা নিষাদঃ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীসমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনেকমবধীঃ কামমোহিতম।' [সুধীরচন্দ্র সরকার-সংকলিত 'পৌরাণিক অভিধান'(কলকাতা ১৯৬৩) পৃষ্ঠা-৩৪৩]

শোকাভিভূত বাল্মীকির কণ্ঠনিঃসৃত বলেই এর নাম 'শ্লোক'। শ্লোকের মাধ্যমেই ব্যাধ বা নিষাদকে অভিশাপ দিয়ে বাল্মীকি বললেন, 'রে নিষ্ঠুর নিষাদ, কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করে ক্রৌঞ্চির মনে যে বিষাদের সঞ্চার ঘটালি, এই অন্যায়ের প্রতিফল তোকে ভোগ করতেই হবে, কখনও তুই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবি না।' পৌরাণিক ঐতিহ্য অনুসারে এই শ্লোকই আদি কবিতা, এবং বাল্মীকিই আদিকবি। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বাল্মীকির নিকট পাঠালে নিজের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে বাল্মীকি জানিয়েছিলেন,

'মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নবসুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছুদূর
ভাবের স্বাধীন লোকে...'

সেই ইচ্ছাকে সফল করে তোলার জন্য অযোধ্যায় রঘুপতি রামের কীর্তিগাথা-সমন্বিত কাব্য রচনা করতে দেবর্ষি নারদ তাঁকে পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শ গ্রহণ করতে বাল্মীকি কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে বললেন যে, রামচন্দ্রের কীর্তিকথা কিছু কিছু তিনি শুনেছেন বটে,

...'তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর-ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে।
পাশে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মনে।'

নারদ তখন তাঁকে এই বলে অভয় দিলেন-

সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি,
রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

মনোভূমিতে বিদ্যমান সত্যকেই বাল্মীকি তাঁর মহাকাব্যে রূপায়িত করে তুললেন। এ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য-

'রামায়ণের আদিকবি, গার্হস্থ্যপ্রধান হিন্দুসমাজের যত-কিছু ধর্ম রামকে তাহারই অবতার করিয়া দেখাইয়াছিলেন পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে, পতিরূপে, বন্ধুরূপে, ব্রাহ্মণধর্মের রক্ষাকর্তারূপে, অবশেষে রাজারূপে বাল্মীকির রাম আপনার লোকপূজ্যতা সমপ্রাণ করিয়াছিলেন। ...

আদিকবি যখন রামায়ন লিখিয়াছিলেন যখন যদিচ রামের চরিতে অতিপ্রাকৃত মিশিয়াছিল তবু তিনি মানুষেরই আদর্শরূপে চিত্রিত হইয়াছিলেন।' সাধারণভাবে গড়পড়তা মানুষের যে-রূপটি আছে বা থাকে, সেটি নয়; মানুষের 'আদর্শ রূপটাই রামায়ণে বড় হয়ে উঠে মহাকাব্যের রূপ নিয়েছিল। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'মোটামুটি কাব্যকে দুই ভাগ করা যাক। কোনো কাব্য বা একলা কবির কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা। একলা কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে, তাহা আর কোনো লোকের অধিগম্য নহে, তেমন হইলে তাহাকে পাগলামি বলা যাইত। তাহার অর্থ এই যে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি আছে, যাহাতে তাহার নিজের সুখদুঃখ, নিজের কল্পনা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের চিরন্তর হৃদয়াবেগ ও জীবনের

মর্মকথা আপনি বাজিয়া ওঠে।

এই যেমন এক শ্রেণীর কবি হইল মেনি, আর একশ্রেণীর কবি আছে যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ একটি সমগ্র যুগ, আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বলা যায়। সমগ্র দেশের, সমগ্র জাতির সরস্বতী ইহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন - ইহারা যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় যেন তাহা বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতলজঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা-কুমারসম্ভবে বিশেষভাবে কালিদাসের নিপুণ হস্তের পরিচয় পাই। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেই, ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ মাত্র।'

কোনো দেশে যথার্থ মহাকাব্য কার হাতে রচিত হয় এবং সেই রচয়িতা মহাকবি হয়ে ওঠেন কোন প্রক্রিয়ায়-সে-রহস্যও রবীন্দ্রনাথের ভাবনাবৃত্তে ধরা পড়েছে-

'প্রথমে নানামুখে প্রচলিত খন্ড গানগুলা একটা কাব্যে বাঁধা পড়িয়া সেই কাব্য আবার যখন বহুকাল ধরিয়া সর্ব সাধারণের কাছে গাওয়া হইতে থাকে, তখন আবার তাহার উপর নানা দিক হইতে নানাকালের হাত পড়িতে থাকে। সেই কাব্য দেশের সকল দিক হইতে আপনার পুষ্টি আপনি টানিয়া লয়। এমনি করিয়া ক্রমশই তাহা সমস্ত দেশের জিনিস হইয়া উঠে। তাহাতে সমস্ত দেশের অন্তঃকরণের ইতিহাস, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মবোধ, কর্মনীতি আপনি আসিয়া মিলিত হয়। যে কবি গোড়ায় ইহাতে ভিত পত্তন করিয়াছেন তাঁহার আশ্চর্য ক্ষমতাবলেই ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। তিনি এমন জায়গায় এমন করিয়া গোড়া ফাঁদিয়াছেন, তাঁহার প্ল্যানটা এতই প্রশস্ত যে, বহুকাল ধরিয়া সমস্ত দেশকে তিনি নিজের কাজে খাটাইয়া লইতে পারেন। এতদিন ধরিয়া এত লোকের হাতে পড়িয়া কোথাও যে কিছুই তেড়াবাঁকা হয় না, তাহা বলিতে পারি না - কিন্তু মূলগঠনটার মাহাত্ম্যে সে-সমস্ত অভিভূত হইয়া থাকে।

আমাদের রামায়ণ-মহাভারত, বিশেষভাবে মহাভারত, ইহার দৃষ্টান্তস্থল।
এইরূপ কালে কালে একটি সমগ্র জাতি যে কাব্যকে একজন কবির কবিত্বভিত্তি আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া তুলিতেছে তাহাকেই যথার্থ মহাকাব্য বলা যায়।'

অ্যাকাডেমিক বিচারে যা মহাকাব্য বলে গণ্য হয় না তেমন কাব্যও প্রকৃত কবির হাতে মহাকাব্যের গুণে ও মহিমায় গুণান্বিত ও মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। বর্তমানের গ্লানির রূপ চিত্রে প্রতিফলিত হওয়ার ফলে যে-কোনো কবিই বেদনাভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু যিনি প্রকৃত ও মহান কবি তাঁর কবিতায় বর্তমানের গ্লানিকে অতিক্রম করে গ্লানিহীন এক কাঙ্খিত ভাবীকালেরই প্রকাশ ঘটে যায়। অর্থাৎ বহির্বাস্তবের দুঃখজনক ঘটনা থেকে উৎসারিত শোককেই শ্লোকে পরিণত করে এবং শ্লোকের পর শ্লোক গ্রথিত করে প্রকৃত কবি যে কাব্য সৃষ্টি করেন, ঘটে না যা এমন 'সত্য'ই সেই কাব্যে রূপায়িত হয়। সেই 'সত্য' শুধু সত্য নয়, তা 'সুন্দর' ও 'শিব' (মঙ্গলময়)-'সত্যম শিবম্ সুন্দরম্'। সত্য-শিব-সুন্দরের রূপাণকারী যাঁরা, তাঁরা মহাকবি না-হলেও সকলেই মহান কবি।

এই মহান কবিদেরই কেউ কেউ মহাকবি হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ কোন্ কাব্যের মাধ্যমে মহাকবি রূপে অভিনন্দিত হতে পারেন-সে-বিষয়টিই বিবেচিতব্য।

৪. প্রাচীন ভারতের বেদব্যাসের নামে প্রচারিত 'মহাভারত' যে একটি অসাধারণ মহাকাব্য-এ-ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশের কোনো সুযোগই নেই। শুধু ভারতের কথা-বা বলি কেন, পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো যুগেই এর জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। মহাভারত শুধু কাব্যই নয়, এটি 'ইতিহাস-পুরাণ' রূপেও নন্দিত। এই একটি গ্রন্থের আধারেই নিহিত আছে 'ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি গরিষ্ঠ ও বরিষ্ঠ আদর্শ, সামগ্রিক যুগ-চেতনার ইতিহাস, প্রাচীন রীতিনীতি, আচার সামগ্রিক যুগ চেতনার ইতিহাস, প্রাচীন রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারের সম্যক ধারণা'। 'ধারণা' নয় শুধু, আনুপূর্বিক বর্ণনা ও বিবরণও। এবং জীবন ও জগতের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও।

প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের সকল বিধানই মহাভারতে একত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। সন্নিবেশিত হয়েছে অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্রের বিধানবলিও। প্রাচীন ভারতে যত খণ্ড খণ্ড কাব্য ছিল, লোকের মুখে মুখে চালু ছিল যে-সব প্রবাদ ও উপখ্যান, মানুষের অন্তর্লোকে বিদ্যমান ছিল যে-সব সংস্কার ও মূল্যবোধ, ভাবনায় ও আচরণে ছিল যে-সব বৈচিত্র ও বৈপরীত্য - এ-রকম সব কিছুরই আধার এই মহাভারত। এমনকি, 'আদিকবি' বাল্মীকির রামায়ণের পুরো কাহিনী ও বক্তব্যও ধরা আছে মহাভারতে। কাব্যের যত প্রকরণ সে-সময়ে উদ্ভাবিত হয়েছিল ও প্রচলিত ছিল মহাভারত সবই ধারণ করেছে। সরল মধুর ও গম্ভীর ভাষায় মুখ্যত অনুষ্টুভ ও ত্রিষ্টুভের মতো সহজ ছন্দের প্রয়োজনে মূল কাহিনীর সঙ্গে বহু পার্শ্বকাহিনী গ্রথিত করে শাশ্বত ধর্মের জয় ঘোষিত হওয়ার কারণেই মহাভারতকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'পঞ্চমবেদ'। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ভিন্টারনিৎস মহাভারতকে কেবলই মহাকাব্য কিংবা কাব্য রূপে চিহ্নিত করতে রাজি হননি। তাঁর মতে, এটি সব ধরনের সাহিত্যেরই ধারক।

(It is only in a very restricted sense that we may speak of the Mahabharata as an 'epic' and a 'poem'. Indeed in a certain sense Mahabharata is not one poetic production at all, best rather a whole literature.)

মহাভারতের কবির কথাতেই অভিব্যক্ত হয়েছে যে, 'ভারতবর্ষে যা আছে, মহাভারতে তা-ই আছে; মহাভারতে যা নেই, ভারতেও তা দুর্লভ'। লৌকিক ভাষায়-'যা নাই ভারতে (অর্থাৎ মহাভারতে), তা নাই ভারতে'। এমন কথা কি পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের কোনো কাব্য কিংবা মহাকাব্য সম্পর্কে বলা যেতে পারে?

অলংকার শাস্ত্রোক্ত রসের সূত্রে মহাকাব্যের প্রাণের সন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা উপলব্ধি করেছেন, সেই উপলব্ধিরই প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি তাঁর 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন,

'আমাদের অলংকারশাস্ত্রে রসাত্মক বাক্য বলিয়া কাব্যের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক সংজ্ঞা আর কোথাও দেখি নাই। ...

...আমাদের অলংকারে নয়টি মূল রসের নামোল্লেখ অলংকারশাস্ত্রে তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই। সেই সমস্ত অনির্দিষ্ট রসের মধ্যে একটিকে ঐতিহাসিক রস নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই রস মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ।
ইতিহাসের সত্য ও কাব্যের রস - দু'য়ের প্রতিই ছিল রবীন্দ্রনাথের গভীর ভালোবাসা, দু'য়ের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিতে শৈল্পিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক স্কটের 'আইভ্যান হো' উপন্যাসে ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃতি ঘটেছে - এই অভিযোগ এনে গোঁড়া ইতিহাসবিদ ফ্রিম্যান এই উপন্যাস পাঠের ওপর নিষেধবিধি আরোপ করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই নিষেধবিধির তীব্র প্রতিবাদ জানান। 'ইতিহাস পড়িব না আইভ্যান হো পড়িব?'- এ-রকম প্রশ্নের উত্তরে কবিগুরুর বক্তব্য ছিল, 'দুই-ই পড়ো। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্যে আইভ্যান হো পড়ো। পাছে ভুল শিখি এই সতর্কতায় কাব্যরস হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিলে স্বভাবটা শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া যায়।

কাব্যে যদি ভুল শিখি ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয়া লইব। কিন্তু যে ব্যক্তি ইতিহাস পড়িবার সুযোগ পাইবে না, কাব্য পড়িবে, সে হতভাগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি কাব্য পড়িবার অবসর পাইবে না, ইতিহাস পড়িবে, সম্ভবত তাহার ভাগ্য আরো মন্দ।'

বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ শুধু 'রসগুরু'ই ছিলেন না, ছিলেন ইতিহাসগুরুও। তিনি যে দৃষ্টিতে ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তার গুরুত্বকে অবলোকন করেছিলেন, তেমন দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন না কোনো জাঁদরেল ইতিহাসবিদও। তখনকার দিনের পাশ্চাত্যের প্রচলিত রীতি পদ্ধতি অবলম্বন করে ভারতবর্ষের ইতিহাসকেও যাঁরা রাজা-সাম্রাজ্য-রাজবংশের ইতিহাসরূপে দেখতে চাইতেন, সে-রকম তথ্য ও বিবরণ না-পেয়ে তাঁরা বলতেন, ভারতের ইতিহাস বলে কিছু নেই।' রবীন্দ্রনাথের মতে, তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একান্তই ভ্রান্ত। এই ভ্রান্তির প্রতিবাদ করেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'ইতিহাস-গুরু'র আসনে বসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন,

'যখন আমরা বলি যে, ভারতবর্ষে ইতিহাসের উপকরণ মিলে না তখন এই কথা বুঝিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে ইউরোপীয় ছাদের ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে।' ...... ইউরোপের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের ঐক্য হইতেই পারে না-এ কথা আমরা বারবার ভুলিয়া যাই। যে ঐক্যসূত্রে ভারতবর্ষের অতীত ভবিষ্যৎ বিধৃত তাহাকে যথার্থভাবে অনুকরণ করিতে গেলে আমাদের শাস্ত্র পুরাণ কাব্য সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়; রাজবংশাবলীর জন্য বৃথা আক্ষেপ করিয়া বেড়াইলে বিশেষ লাভ নাই। ইউরোপীয় ইতিহাসের আদর্শে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে এ কথা আমাদিগকে একেবারেই ভুলিয়া যাইতে হইবে।'

আমাদের এই উপমহাদেশের ইতিহাস যে 'রাষ্ট্রীয় ইতিহাস' নয় আমাদের দেশে-যে ইউরোপীয় অর্থে 'রাষ্ট্র'ই গড়ে ওঠেনি, রবীন্দ্রনাথের অনুভবে সে-বিষয়টি অত্যন্ত স্ফটিক স্বচ্ছরূপেই ধরা পড়েছিল। ১৯০৪ সনেই 'স্বদেশী সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁর নিজস্ব ইতিহাস-বোধের প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে 'স্টেট নয়, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্বনির্ভর গ্রাম-সমবায়গুলিই ছিল সমাজের কেন্দ্রবিন্দু, রাজশক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল নিতান্তই পরোক্ষ। এ-রকম ব্যবস্থাকেই তিনি 'সমাজতন্ত্র' আখ্যা দিয়েছিলেন এবং জানিয়েছিলেন,

'চিরদিন ভারতবর্ষ ও চীন দেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। ...এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের; রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান; সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায়। গ্রীস, রোম এমনি করেই মারা গিয়েছে। কিন্তু চীন, ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে, তার কারণ সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত।'

সর্বব্যাপী সমাজে দেশের আত্মা প্রসারিত থাকার পরম সত্যটি চিত্তে ধারণ করেই রবীন্দ্রনাথ এদেশের ইতিহাসের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনা করে গেছেন। বিভিন্ন প্রবন্ধে বিশেষ করে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'প্রাচ্য পাশ্চাত্য সভ্যতা' এবং এ ধরনের আরো কয়েকটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চেতনার স্পষ্ট অভিব্যক্তি ঘটেছে। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন,'ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়।' রবীন্দ্রনাথ যে সেরূপ কুসংস্কার পুরোপুরিই বর্জন করেছিলেন, তাঁর বিবিধ রচনাতেই সে-পরিচয় তিনি রেখে গিয়েছেন। পৃথিবীর অন্য দেশের ইতিহাস থেকে আমাদের এই উপমহাদেশের ইতিহাসের স্বাতন্ত্র্যকে তিনি কখনো ভুলে থাকেননি, কাব্য তথা সাহিত্য রচনাতেও তিনি সেই ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্রকে চেতনায় সদা-জাগ্রত রেখেছেন। কোনোরূপ ঐতিহাসিক ভ্রান্তিবিলাসে তিনি কখনো আক্রান্ত হননি।

তবে সেই সঙ্গেই মনে রাখতে হবে যে, কোনোরূপ স্বাতন্ত্র্য-চেতনাই তাঁকে বৈশ্বিক ঐক্যচেতনা থেকে বিযুক্ত করতে পারেনি। 'সীমার মাঝে অসীমের' সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি। তাই সর্বদা সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ছিল তাঁর অবস্থান। পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি অনেক কীর্তিমান সাহিত্য-সাধকের সঙ্গেই এ-বিষয়ে তাঁর পার্থক্য একান্ত স্পষ্ট।

প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রোক্ত নয়টি রসের বাইরে যে সকল 'অনির্বচনীয় মিশ্ররস'-এর প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, 'ঐতিহাসিক রস'সহ সে রকম সকল রসই রবীন্দ্রসাহিত্য ধারায় প্রবহমান। রবীন্দ্রনাথের সকল রচনাতেই যে সর্বপ্রকার রসের সমান সংযুক্তি ঘটেছে, তেমনটি অবশ্যই নয়। তার সকল রচনার ঐকত্রিক রূপের মধ্যেই প্রকৃত রসগুরু রবীন্দ্রনাথকে যেমন পাওয়া যাবে, তেমনই পাওয়া যাবে ইতিহাস গুরু এবং অপূর্ব ও অচিন্তিতপূর্ব মহাকাব্যের স্রষ্টা মহাকবি রবীন্দ্রনাথকেও। খণ্ড খণ্ড করে দেখলে তার সেই মহাকাব্য ও মহাকবিত্ব আমাদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যাবে, বিভ্রান্তিই এসে আমাদের গ্রাস করবে। অথচ এ রকম বিভ্রান্তি আমরা প্রতিনিয়তই ছড়িয়ে যাচ্ছি; রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনেক নামজাদা সমালোচকও এ রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছেন। সেই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তিলাভের জন্যও রবীন্দ্রনাথেরই শরণ নেওয়া অপরিহার্য। যে কোনো সাহিত্যের সমালোচনা ও সুবিচারে সঠিক পন্থাটি কী হওয়া উচিত এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে কবি যে উত্তরটি দিয়েছিলেন, সেটিই পাই তাঁর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থটিতে,

'সে-সমালোচনার মধ্যে শান্তি নাই, যা কেবলমাত্র আঘাত দেয়, কেবলমাত্র অপরাধটুকুর প্রতিই সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করে, আমি তাকে ঠিক মনে করিনে। এরূপ সমালোচনার ভিতর একটা জিনিস আছে যা বস্তুত নিষ্ঠুরতা এটা আমাকে পীড়ন করে। সাহিত্যিক অপরাধের

বিচার সাহিত্যিকভাবেই হওয়া উচিত। অর্থাৎ, রচনাকে তার সমগ্রতার দিক থেকে দেখতে হবে। অনেক সময়ে টুকরো করতে গেলেই এক জিনিস আর হয়ে যায়। সমগ্র পটের মধ্যে যে ছবি আছে, পটটাকে ছিঁড়ে তার বিচার চলে না-অনন্ত সেটা আর্টের বিচার নয়। সুবিচার করতে হলে যে শান্তি মানুষের থাকা উচিৎ সেটা রক্ষা করে আমরা যদি আমাদের মত প্রকাশ করি, তাহলে সে মতের প্রভাব অনেক বেশি হয়। বিচারশক্তির প্রেস্টিজ শাসন শক্তির প্রেস্টিজের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা বলি, সুবিচার করার ইচ্ছাটা দণ্ডবিধান করবার ইচ্ছার চেয়ে প্রবল থাকা উচিত।' রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের আলোকে পথ চললেই রবীন্দ্রসৃষ্টির অন্তর্লোকে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে, তাঁর রচনাকে খণ্ড খণ্ড করে দেখার ভ্রান্তি থেকে আমাদের মুক্তি ঘটবে। তেমন মানসমুক্তি ঘটলেই আমরা রবীন্দ্রনাথের মহাকাব্যটির সন্ধান পেয়ে যাব এবং তাঁকে শুধু মহান কবিরূপেই নয়, মহাকাব্যের কবিরূপেও চিনে নিতে পারব। এ রকম চিনে নেওয়ার কাজেই এবার প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

৫. আমরা জেনেছি যে, ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতে প্রাচীন-ভারতবর্ষের ভাব-ভাবনা রীতি-নীতি যুদ্ধ-শান্তি সাম্য-বৈষম্য ইতিহাস-পুরাণসহ সমস্ত প্রসঙ্গই সমগ্রতা নিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে; সেকালে কাব্য বা সাহিত্যের ছন্দ-অলংকারসহ যত প্রকার প্রকরণ উদ্ভাবিত হয়েছিল ও প্রচলিত ছিল, মহাভারত সে-সমস্তই আত্মস্থ করে নিয়েছে; সকল জ্ঞাতব্য বিষয়েরই খণ্ডতাকে অতিক্রম করে অখণ্ডকে ধারণ করেছে। সে কারণেই সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসকারের অনুভবে ধরা পড়েছে যে, মহাভারতকে শুধু প্রচলিত অর্থে 'এপিক' বা 'পয়েম' বলে গণ্য করলে চলবে না, মহাভারত হলো 'হোল লিটারেচার' বা সমগ্র সাহিত্যের ধারক।

যদি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসম্ভারকে নানা অংশে বিভক্ত ও খণ্ড খণ্ডরূপে অবলোকন করি, তবে আমরা রচিত সেই মহাকাব্যটিকে কিছুতেই চিনে নিতে পারব না। অথচ, এতকাল আমরা এ রকমই করে এসেছি। কবি রবীন্দ্রনাথ, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ, বাংলা ছোট গল্পের স্রষ্টা ও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পকার রবীন্দ্রনাথ, প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ নানা খণ্ডে বিভক্ত করে আমরা রবীন্দ্র-প্রতিভা বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি। আমাদের সে প্রয়াস অখণ্ড রবীন্দ্রনাথকে অবলোকনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। সেই খণ্ডাবলোকনের পথ ছেড়ে অখণ্ড দৃষ্টিক্ষেপ করতে হবে যে গ্রন্থটির প্রতি, সেটির নাম 'রবীন্দ্র রচনাবলী'।

হ্যাঁ, একটি গ্রন্থ এই রবীন্দ্র রচনাবলী। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নামে গ্রন্থিত 'মহাভারত' যেমন একটি গ্রন্থ, তেমনই একটি গ্রন্থ এই রবীন্দ্র রচনাবলী। আঠারোটি পর্বে ও বহু বহু অধ্যায় ও উপ-অধ্যায়ে বিন্যস্ত মহাভারতের মতোই রবীন্দ্র রচনাবলীও অনেকগুলো পর্বে বা 'আবলী'তে বহু বহু প্রসঙ্গ ও প্রকরণের ধারক একটি গ্রন্থ। সেকালের ভারতের সব কিছুকেই ধারণ করেই অখণ্ড রূপ পেয়েছিল মহাভারতে। আর একালের শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতের সবকিছুকে ধারণ করে অখণ্ডরূপ পেয়েছে রবীন্দ্র-রচনাবলীতে। 'যা নাই ভারতে (মহাভারতে) তা নাই ভারতে (ভারতবর্ষে)'-সেই বক্তব্যের অনুসরণেই আমরা নির্দ্বিধায় বলে ফেলতে পারি 'যা নাই রবীন্দ্রে তা নাই জগতে'। ('রবীন্দ্রে' মানে রবীন্দ্র রচনাবলীতে।')

'আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগলপারা'- কবি জীবনের উন্মেষ-লগ্নে এমন আকাঙ্খা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ঘটায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন-'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেলি খুলি/জগৎ আমি সেথা করিছে কোলাকুলি'। জগতের সঙ্গে এই কোলাকুলির

ভেতর দিয়েই সারা জীবন ধরে চলেছে তাঁর কাব্যসাধনা তথা জীবনসাধনা এবং সেই সাধনারই মূর্ত রূপ রবীন্দ্র রচনাবলী। মহাভারতের পর এই রবীন্দ্র-রচনাবলী হলো 'মহাজগৎ'। এবং মহাভারতের পর সারা জগতের একমাত্র মহাকাব্য।
কী করে এটি মহাকাব্য হলো? এ-তাবতকালের সাহিত্যশাস্ত্রীদের নির্দেশিত পথে হেঁটে নজিরবিহীন এই মহাকাব্যের স্বরূপ-সন্ধান যে করা যাবে না, সে কথা না বললেও চলে। তবে নতুন পথের দিশা যে পূর্বাচার্যদের কাছে একটু পাওয়া যাবে না, তা-ও নয়। রবীন্দ্রনাথও সেই পূর্বাচার্যদের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেই মহাকাব্যের স্বরূপ সম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। 'কালে কালে একটি সমগ্র জাতি যে কাব্যকে একজন কবির কবিত্বভিত্তি আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া তুলিতেছে তাহাকেই মহাকাব্য বলা যায়' - রবীন্দ্রনাথের এই কথার 'একটি সমগ্র জাতি'র বদলে 'সমগ্র জগৎ' কথাটা যদি ব্যবহার করি, তাহলেই আমার মনে হয়, রবীন্দ্র রচনাবলীকে এ যুগের মহাকাব্যরূপে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারব। রবীন্দ্রনাথ নামক একজন মহাকবির কবিত্ব-ভিত্তিকে আশ্রয় করে সমগ্র জগৎকে নিয়েই রচিত হয়েছে এ যুগের এই মহাকাব্যটি। পূর্বকালের মহাকাব্যের সকল লক্ষণ তো এতে অভিব্যক্তি লাভ করেছেই, অনেক নতুন প্রসঙ্গ-প্রকরণ-লক্ষণও এই মহাকাব্য তার অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে। নিজেকে যে তিনি 'নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা' বলে চিহ্নিত করেছিলেন, সেই পরিচয়-চিহ্নই একত্রীভূত রূপ ধারণ করেছে এই মহাকাব্যে। সেই অভিন্ন মালার ভিন্ন ভিন্ন ফুলগুলোকেও চিনে নেওয়া বিধেয় বটে। তবে সেই মালাটি গাঁথা হয়েছে যে সুতোটি দিয়ে, সেই কুসুম'-এর মধ্যে পুরো মালার মহিমা কিংবা মালাকারের কৃতিত্বের কোনো কিছুই ধরা পড়ে না।

একদেশদর্শী যারা, সমগ্র জীবন দৃষ্টি যাদের দিগন্ত নয়, এমন অনেক সমালোচকের দৃষ্টিতেই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রূপের প্রতিফলন ঘটেনি। প্রকৃত ভাবগ্রাহী নন যে, সব সমালোচক, রবীন্দ্রনাথের ভেতরকার অনেক ভাব ও ভাবারই খোঁজ তারা পাননি। কেউ কেউ তো রবীন্দ্রনাথের রচনায় 'বস্তুতন্ত্রতার অভাব'ও দেখেছেন। এসব সমালোচকের অবস্থাটা হয়েছে বাঁশ বনে ডোম কানা'র মতো। এ রকম সমালোচকদের প্রসঙ্গেই কবিগুরুর বক্তব্য ছিল-

'লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ মঙ্গল এবং উপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংঘর্ষের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছে। আমার কাব্য সমগ্র আলোচনা করে দেখলে হয়তো তারা দেখবেন আমার প্রতি অবিচার করেছেন।' বহুভাবেই বহুজন রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার করেছেন ও করছেন। সে রকম অবিচার করা থেকে আমরা অবশ্যই বিরত থাকব। সে জন্যই 'বিশ্বসাহিত্যের দরবারে' যার 'স্থান উচ্চতম শ্রেণিতে' সেই 'মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মহাকাব্য' রবীন্দ্র-রচনাবলীর অমিয় সাগরে অবগাহন করতে হবে আমাদের।

'নিশিদিন ভরসা রাখিস'
রবীন্দ্রভাবনায় সমাজ ও শিক্ষা

ড. আতিউর রহমান

"জাহাজের খোলের ভিতরটায় যখন জল বোঝাই হয়েছে, তখনই জাহাজের বাইরেকার জলের মার সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। ভিতরকার জলটা তেমন দৃশ্যমান নয়, তার চালচলন তেমন প্রচণ্ড নয়, সে মারে ভারের দ্বারা, আঘাতের দ্বারা নয়, এই জন্য বাইরের ঢেউয়ের চড়-চাপড়ের উপরেই দোষারোপ করে তৃপ্তি লাভ করা যেতে পারে; কিন্তু হয় মরতে হবে, নয় একদিন এই সুবুদ্ধি মাথায় আসবে যে, আসল মরণ ঐ ভিতরকার জলের মধ্যে, ওটাকে যত শীঘ্র পারা যায় সেঁচে ফেলতেই হবে। কাজটা যদি দুঃসাধ্যও হয় তবু এ কথা মনে রাখা চাই যে, সমুদ্র সেঁচে ফেলা সহজ নয়, তার চেয়ে সহজ খোলের জল সেঁচে ফেলা। এ কথা মনে রাখতে হবে, বাইরে বাধাবিঘ্ন বিরুদ্ধতা চিরদিনই থাকবে, থাকলে ভালো বৈ মন্দ নয় - কিন্তু অন্তরে বাধা থাকলেই বাইরের বাধা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এই জন্যে অভিজ্ঞার দিকে না তাকিয়ে সাধনার দিকে তাকাতে হবে, তাতে অপমানও যাবে, ফলও পাব।" (রবীন্দ্রনাথ, 'বাতায়নিকের পত্র', রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড পৃ-৫৮৩)।

উপরের বাক্যগুলো থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ বাঙালির মনের আবর্জনা দূর করার জন্য কতটা উদগ্রীব ছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত মানুষের ওপর আস্থা রাখার পক্ষেই ছিলেন। মানুষের শুভবুদ্ধি এবং মানবিকতায় বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর সকল লেখাতেই 'আত্মশক্তি'র বিকাশ দেখতে চাইতেন। অন্যের কাছে দয়াদাক্ষিণ্য প্রত্যাশা না করে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আত্মসম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকায় বিশ্বাসী মানুষ গড়ার কাজে রবীন্দ্রনাথ আজীবন নিবেদিত ছিলেন। মনের অকিঞ্চিৎকরতা কাটিয়ে বৃহৎ মানবসমাজের গর্বিত অংশীদার হওয়ার এই অনুপ্রেরণা সমাজ থেকেই আসতে পারে। আর তেমন সচেষ্ট সমাজ গড়ার জন্য গুণমানের শিক্ষার কোনো বিকল্প যে নেই, সে কথাটি রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে নানা উপলক্ষে বলেছেন। মনের পরিবর্তনের জন্য যে উদার শিক্ষার প্রয়োজন, সে কথাটি বিশ্বাস করতেন বলেই অভিনব মানুষ-সেবাধর্মী শিক্ষালয় স্থাপনে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। শিলাইদহ, পতিসর, শাহজাদপুরে প্রজাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করার স্বার্থে জমিদারি রাজস্বের একটা অংশ বরাদ্দ করতেন। সেই আমলেই মেয়েদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। আধুনিক কৃষির উন্নয়নে নিজের ছেলেকে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে এনে শিলাইদহে আধুনিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উৎসাহী করেছেন। পতিসর ও শাহজাদপুরেও আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে কৃষি খামার পরিচালনা করে, উন্নত জাতের কৃষিবীজ ও গাভী সংগ্রহ করে কৃষকদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কৃষকদের ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য তিনি উৎসাহ দিতেন এবং গ্রামীন মেলা, নানা সঙ্গীত ও অন্যান্য উৎসবের আয়োজন করতেন। এসব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী সময়ে তিনি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী শিক্ষায়তন ও শ্রীনিকেতনে সমবায় ব্যবস্থায় মৃৎশিল্পসহ নানা প্রকারের কুঁটির শিল্প গড়ে তোলেন। উদ্দেশ্য, মানুষকে মনের দিক থেকে ও ধনের দিক থেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে

তোলা। সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারে তাঁর এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আধুনিক বাঙালির নবজাগরণে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। আজও আমরা তাঁর সৃজনশীল সমাজ ও শিক্ষা ভাবনায় উজ্জীবিত হই এবং তাঁর আরাধ্য 'মানুষের মতো মানুষ' হওয়ার স্বপ্ন দেখি। তাঁকে কেন্দ্র করেই আমরা উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় নিশিদিন ভরসা রাখি।

তবে এখনও বাংলাদেশের সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে রবীন্দ্রভাবনার আলোকে উপযুক্ত সংস্কার করে উঠতে পারিনি। 'মানুষের মতো মানুষ' গড়ার সহায়ক সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা আজও নিশ্চিত করতে পারিনি। তবে নারীশিক্ষাসহ সার্বিক শিক্ষায় বাংলাদেশ প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। সংখ্যার বিচারে শিক্ষার প্রসারও ঘটেছে। তার সফলও পেতে শুরু করেছি। নারীর ক্ষমতায়ন যে ঘটেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে গুণের বিচারে শিক্ষাচর্চা সেভাবে যে হচ্ছে না, সে কথাও নিশ্চয় বলা যায়। শিক্ষায় গুণের এই ঘাটতি নিঃসন্দেহে হতাশাজনক।

তাছাড়া বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে সহিংসতা বাড়ছে। নারী ও শিশু তার শিকার হচ্ছে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নানামাত্রিক দুর্যোগের মাত্রা বাড়ছে। বেশি করে ঝড়-বৃষ্টি ও বন্যা হচ্ছে। উপকূলে লোনা পানির প্রবেশের গতি বাড়ছে। বন্যার কারনে নদীর কূল ভাঙছে। চর জাগছে। ফলে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার উদ্বাবস্তুরা বাঁচার তাগিদে শহরে আসছে। শহরে এসে মানবেতন জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। হয়তো আ-রোজগার করে তারা কোনোমতে বেঁচে আছেন। কিন্তু তাদের পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আলগা হয়ে যাচ্ছে। একটা সময় ছিল সমাজ তাদের সুরক্ষা দিত। রবীন্দ্রভাবনায় স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, সমাজই ছিল সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, "...আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়। অন্যদেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে-আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকল প্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। ...সেই সমাজকেই আমাদের সর্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক" (রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষীয় সমাজ". দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬২৩-৬২৪)। কাঙ্খিত এই সামাজিক শক্তির বিকাশের জন্য নাগরিকদের যে 'মাইন্ডসেট' বা মান সপট দরকার তা তৈরিতে শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ কথাও রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে বলেছেন এবং লিখেছেন। এই ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থা বিনির্মাণে রবীন্দ্রভাবনার দিকগুলো প্রণিধানযোগ্য:

- ❖ শিক্ষা আর জীবন আলাদা হতে পারে না। শিক্ষাকে 'জীবনের খাদ্য' হতে হবে। 'এখানে নোটের নুড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রির বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের খাদ্য নহে।' (রবীন্দ্রনাথ, 'লক্ষ্য ও শিক্ষা', ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ৬৯৮)
- ❖ উদ্যমশীল এক জীবনের জন্য বিদ্যাকে প্রাণের মধ্যে আয়ত্ত করতে হবে। চাই সেই প্রাণস্পর্শী শিক্ষা। বৃহত্তর মানব সমাজই হতে পারে মানুষ গড়ার বড়ো পাঠক্রম। 'ছাঁচে ফেলার শিক্ষা নয়, মানুষ না হয়ে মাস্টার মশাই হবার শিক্ষা নয়, কেবল পাঠ দেবার নয়, প্রাণ দেবার শিক্ষা চাই।' (রবীন্দ্রনাথ, 'লক্ষ ও শিক্ষা, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৬৯৮)। 'প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে'-সে কথা রবীন্দ্রনাথই তার গানে বলে গেছেন। সেজন্যই চাই মননশীল শিক্ষা। চাই প্রাণ উজ্জীবনের শিক্ষা।
- ❖ "চিত্তের গতি অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতে হয়।...নান লোকের নানা চেষ্টার

সমবায়ে আপনিই সহজ পথটি অঙ্কিত হইতে থাকে। এই জন্য সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্যপথ-আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা।" (রবীন্দ্রনাথ, 'লক্ষ্য ও শিক্ষা, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৬৯৮)। আমাদের সন্তানদের শিক্ষার সেই স্বাধীনতা কদ্দুর দিতে পারছি-সে প্রশ্ন কিন্তু করাই যায়।

❖ শিক্ষার লক্ষ্য হতে হবে সৃষ্টিশীল ভাবনার মুক্তি। যারা শিখছে তাদের শিশুকাল থেকে তর্ক করার, যুক্তির প্রয়োগ ও বিশ্ব ভাবনার আনুকূল্য দিয়ে যেতে হবে। তেমন উদারনৈতিক শিক্ষা কি আমরা আদৌ আমাদের সন্তানদের দিতে পারছি? 'সৃজনশীল' শিক্ষার নামে যা আমাদের সন্তানদের ইদানিং গেলাচ্ছি তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব কী হতে পারে সে কথাটিও কি আমরা গভীরভাবে ভাবছি?

❖ "অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে, এমন করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে, তাহার চেতনার অধিকার যে চারিদিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে এইটেই গোড়াকার কথা"। (রবীন্দ্রনাথ, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৫৫২)। মানুষে-মানুষে যোগাযোগই বড় কথা। আর সুশিক্ষাই পারে সেই যোগাযোগ বাড়াতে।

❖ "সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে রুচির পক্ষে, মাত্রাজ্ঞানের পক্ষে নীতি-নৈতিকতার পক্ষে, মূল্যবোধ ও চিন্তার আভিজাত্যের পক্ষে।" (রবীন্দ্রনাথ, কালি ও কলম, ৭ম বর্ষ একাদশ সংখ্যা, পৃ. ২২৭)। তাই শিক্ষার সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির চর্চা দরকার, মনুষ্যত্ববোধের চর্চা দরকার, ভালোবাসার চর্চা দরকার। দরকার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধ শিক্ষার। একাত্তর ও আমাদের অন্যান্য সংকটকালে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মের ডালি নিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিরেন, সে বিষয়টি কি আমরা আজকের তরুণ শিক্ষার্থীর মনে গেঁথে দিতে পেরেছি?

❖ জ্ঞানসামগ্রীর কোনো সীমা নেই। ভাবের পণ্য বোঝাই করাই শিক্ষার কাজ। প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রীর চাপে চাপা পড়ে যাওয়া শিক্ষিত মানুষ কারও জন্য মঙ্গল বয়ে আনে না। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, এখনও আমরা তেমন 'শিক্ষিত' মানুষই তৈরিতে ব্যস্ত রয়েছি। তাই আসল মানুষের সন্ধান মিলছে না।

❖ জাতি, ধর্ম, গোত্র, শ্রেণী, পেশা নির্বিশেষে সব মানুষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ জীবনাচরণের শক্তি দেবে শিক্ষা।

❖ শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এই জন্য কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম। "(রাশিয়ার চিঠি, দশম খণ্ড, পৃ. ৫৫৫)

❖ শিক্ষা তাই জীবন-বিচ্ছিন্ন কোনো প্রস্তাবনা হতে পারে না। যা জীবন তা-ই বাস্তব, শিক্ষা স্বাধীনতার ধারাবাহিকতার ক্ষেত্র প্রসারিত করে। মানব জগতের জন্য যা সব থেকে প্রয়োজনীয় তা'হল বিশ্বজগতের মাঝে নৈতিক যোগাযোগের স্বাধীনতা। (রবীন্দ্রনাথ, 'শিক্ষার আদর্শ', বিশ্বভারতীয় ত্রৈমাসিক, এপ্রিল-জুলাই পৃ. ৭৩-৭৪)

❖ "আমরা কী হইব এবং কী শিখিব এই দু'টা কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড়ো জল তাহার চেয়ে বেশি ধরে না।" (রবীন্দ্রনাথ, 'রাশিয়ার চিঠি' , ঐ পৃ. ৬৯৯)

❖ জ্ঞান ও প্রযুক্তির হস্তান্তরের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ নির্মাণ সম্ভব। সেই বাংলাদেশ হবে আধুনিক স্মার্ট এবং ন্যায্য।

❖ 'আশা করিবার ক্ষেত্র বড়ো হইলেই মানুষের শক্তিও বড়ো হইয়া বাড়িয়া ওঠে। শক্তি

তখন স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পায় এবং জোর করিয়া পা ফেলিয়া চলে।'(রবীন্দ্রনাথ, 'লক্ষ্য ও শিক্ষা', ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৬৯৮)। সেই আশার অভিমুখ যাত্রাই একটি জাতির জন্যে মস্ত কথা।

আমরা বাংলাদেশকে অচিরেই উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এক সময় উন্নত বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এক সময় উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নও আমাদের রয়েছে। এই স্বপ্ন পূরণে দক্ষ জনশক্তি নির্মাণের কোনো বিকল্প নেই। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার কৌশল গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ। এর প্রভাব আমাদের সমাজ ও শিক্ষার ওপর পড়তে শুরু করেছে।

আবার আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সামাজিক মাধ্যমের কল্যাণে শহরে কিংবা গ্রামে নিঃসন্দেহে সামাজিক যোগাযোগ অনেকটাই বেড়েছে। তবে একই সঙ্গে তার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। কেননা এর মাধ্যমে সমাজের ভেতরে সংযোগ বাড়ছে না। বরং বাড়ছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা।

অর্থনীতিবিদ ড. সেলিম জাহান তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ 'বেলা অবেলার কথা' (প্রথমা, ২০০৮) বইতে এই বিষয়টি আরও খোলাসা করেছেন। তাঁর মতে, "যোগাযোগ হচ্ছে কথার, তথ্য বিনিময়ের, সংবাদ নেওয়ার। সংযোগটা হচ্ছে মনের, হৃদয়ের, চোখে চোখ রাখার, স্পর্শের। যোগাযোগের জন্য সামনাসামনি উপস্থিতির প্রয়োজন নেই, সংযোগের জন্য সেটা প্রয়োজন। নানান সামাজিক মাধ্যমের কারণে কতজনের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে, কিন্তু সংযোগের জন্য লাগবে সামনাসামনি বসা, চোখে চোখ রেখে গল্প করা, হাতে হাত রেখে হৃদয়ের উষ্ণতা অনুভব করা। যোগাযোগ সংযোগের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত, কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়।

এই তো একই ঘরের চালার নিচে বসে বাবা হয়তো টেলিভিশনে বিশ্বসংবাদ দেখছেন, মা হয়তো মুঠোফোনে দূরের কোনো বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলছেন, ছেলেটি ওয়েবপত্রে ব্যস্ত। যোগাযোগ রাখছেন তারা বাইরের বিশ্বের সঙ্গে, কিন্তু পারিবারিক কোনো সংযোগ নেই। যে সংযোগে মন ভরে ওঠে, হৃদয় আপ্লুত হয়, সম্পর্কের উষ্ণতায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সারা চেতনা, এ গৃহে সে সংযোগ কোথায়? (সেলিম জাহান, ঐ, পৃ. ১০৪)। সর্বাধুনিক এই প্রযুক্তির যুগে আমরা আমাদের সনাতনি মূল্যবোধের শিকড় যেন উপড়ে ফেলছি। তাই আমাদের ভবিষ্যৎ মূল্যবোধের ঠিকানা অনিশ্চিত। এর নেতিবাচক প্রভাব আমাদের শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের ওপরও পড়ছে। শিক্ষার গভীরতায় মগ্ন না হয়ে তরুণরা অনেক বেশি সামাজিক মাধ্যমে ব্যস্ত থাকছে। এতে করে হয়তো তথ্য মিলছে, কিন্তু জ্ঞানার্জনের স্পৃহা কমতে শুরু করেছে।

এমন এক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা আজও খুবই প্রাসঙ্গিক হতে পারে। তিনি মনে করতেন সমাজের ভেতরের প্রাণশক্তি যদি নিঃশেষিত হয়ে থাকে, তাহলে বাইরের পরিবর্তনই তার ইচ্ছামাফিক জায়গা করে নেবে। সবার কল্যাণের চেতনা যদি সব কাজের মধ্যচিন্তা না হয় তাহলে বাইরের পরিবর্তন ভেতরের সঙ্গে কোনো বোঝাপড়াই করতে পারবে না। এর ফলে দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা আমাদের পূর্বদেশীয় সমাজের পারস্পরিক আত্মীয়তা ও সহমর্মিতার বন্ধন বরং আলগা হয়ে যাবে। সমাজ দিক হারাবে। তাল হারাবে। বিভ্রান্ত হবে। বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে চারদিকে। আর তখনই দেখা দেবে আমাদের সংস্কৃতির মূল সংকট। বাইরের চাকচিক্য সত্ত্বেও দেখা দেবে এই অবক্ষয়। ভেতর থেকে ক্ষয়ে যাওয়া এই

প্রবণতাকে রুখতে হলে আস্থা রাখতে হবে আমাদের নিজেদের ঐতিহ্য, অর্জন জীবনাচার ও লোকায়াত জ্ঞানের ওপর। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই আমাদের সমাজের এসব শুভশক্তির ওপর জোর দিয়েছেন।

তবে এ কথাও ঠিক, তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের জীবনকে অনেকাংশই সহজ করে দিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও এর যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। নতুন কিছু জানার সুযোগও বেশ বাড়িয়েছে। সারাবিশ্ব থেকে শিক্ষা নেওয়ার মতো বাতায়ন খুলে দিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি। নিমিষেই অর্থ লেনদেনের সুযোগ করে দিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি। তাই একজন রিকশাচালকও নিয়মিত মোবাইল ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করছেন। গ্রামে থাকা তার পরিবার নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ করতে পারছে। তাদের ভোগে স্থিতিশীলত বেড়ে গেছে। দারিদ্র কমছে, পুষ্টিমান বাড়ছে। তাই এতটা নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। নিশ্চয় নতুন ও পুরনো মিলেই আমরা নয়া পৃথিবী গড়তে সক্ষম হবো। তা না হলে বাইরে থেকে পরিবর্তনের যে দমকা হাওয়া এখন বইছে, তাই আমাদের ঠেলে নেবে সামাজিক বিকারের দিকে, শুরু হবে প্রান্তিকরণ। নিষ্ঠুরায়ন। নিঃস্বায়ন।বিমানবিকরণ। এসবের স্পষ্ট লক্ষণ আমাদের সমাজে এরই মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সাবধান না হলে হয়তো এসবই আরও দ্রুতগতিতে ঘটবে। আর সে জন্যেই ডিজিটাল প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করার দিকে আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে।

এমন দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যে ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি অর্জনের প্রয়োজন, সে কথা শতবর্ষ আগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় ও কর্মে বলে গেছেন। প্রাচীন সমাজে যে 'আত্মশক্তিই মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে, তাকে অবলম্বন করে আমরা কিন্তু এখনও আমাদের স্ব-উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণ করতে পারি। শুরুতেই যেমনটি বলেছি, প্রীতির বাঁধনে লোকসাধারণের হিতসাধনই ছিল রবীন্দ্রনাথের আরাধ্য। জীবন চলাকে সুন্দর করার জন্য তাঁর ভাবনা ও উদ্যোগ ছিল চিরন্তন। শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও একেবারে মৌলিক ও সৃজনশীল উপায়ে তিনি সাধারণ মানুষকে তাদের হিতের জন্য সংগঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেজন্যই তিনি শিলাইদহ, পতিসর ও শান্তিনিকেতনে সমবায়ভিত্তিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। মানুষের সীমাহীন লোভের বিপরীতেও এক সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আকাঙ্খা মানুষের বরাবরই ছিল এবং এখনও আছে। 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়' স্লোগানসহ হালের টেকসই উন্নয়ন কৌশলের যে বিশ্ব এজেন্ডা বর্তমানে চালু হয়েছে, তার মূল অনুপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখাতেই খুঁজে পাওয়া যায়।

'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে'-এ কথা তো রবীন্দ্রনাথেরই। সমাজ, অর্থনীতি ও পরিবেশের চ্যালেঞ্জগুলোকে এক সুতোয় গাঁথার অভাবনীয় কল্পনাশক্তির পরিচয় শতবর্ষ আগেই রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন। আর্থিক বৈষম্যের শিকার গরিব মানুষের দুঃখ ও তা থেকে পরিত্রাণের উপায় রবীন্দ্রনাথের লেখায় বারেবারে এসেছে। 'দু বিঘা জমি'র 'উপেন' এই চিন্তার প্রতীকমাত্র। তাছাড়া 'সমবায় নীতি', 'পল্লী প্রকৃতি', 'রাশিয়ার চিঠি'তে সাধারণ মানুষের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সর্বজনীন শিক্ষার অবদানের কথা রবীন্দ্র রচনাবলিতে গভীরভাবে স্থান করে নিয়েছে। সর্বত্রই তাঁর সাম্যচিন্তা প্রাধান্য পেয়েছে।

কৃষির আধুনিকায়ন, গ্রামীণ সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে মহাজনি ঋণ থেকে কৃষকদের মুক্তি

দেওয়া, পানীয়জলের সংস্থান, গ্রামীণ হাসপাতাল স্থাপন, সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য হিতৈষী সংঘ ও মণ্ডলী ব্যবস্থার প্রচলন, জমিদারি আয়ের একটি অংশ প্রজাদের সন্তানদের শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে ব্যয় করাসহ মানবিক সমাজ গঠনে তিনি অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। পূর্ব বাংলায় জমিদারি ব্যবস্থা পরিচালনার সময় তিনি কৃষকদের দুঃখ-বঞ্চনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন বলেই তাদের সে দুঃখ মোচনে নানা সামাজিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন জমিদার হিসেবে তিনি তাঁর এস্টেটের বড়জোর একজন ট্রাস্টি মনে করতেন। এ থেকে অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি বড়ই বিব্রত ছিলেন। তাই কীভাবে প্রজাদের আত্মশক্তিতে বলীয়ান করা যায় সে বিষয়টিই নিশিদিন ভাবতেন। তাদের স্ব-উন্নয়নে নিরন্তর ভরসা দিতেন। তাঁর নায়েব ও কর্মচারীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও অসাম্প্রদায়িক রবীন্দ্রনাথ সব ধর্মের প্রজাদের একই চোখে দেখতেন। একইভাবে তাদের ভাগ্যোন্নয়নে ব্রত হতেন।

শিক্ষার মাধ্যমে কীভাবে মানুষ স্বাধীন হয়ে উঠতে পারে সে কথা নিবিড়ভাবে ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর এই ভাবনায় ঔপনিবেশিক শিক্ষায় যে অন্তঃসারশূন্যতা তা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি আমাদের সমাজে শিক্ষার নামে যে দীর্ঘদিন ধরে 'প্রতীচ্য' ভূতের মতো মাথায় চেপে বসে আছে তাও ধরা পড়েছে। নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সচল অস্তিত্বেরই অংশ। আমাদের চিরসঙ্গী। স্বদেশকে তিনি নিরন্তর তন্ন তন্ন করে আমাদের সমাজের মাঝেই খুঁজে বেড়িয়েছেন। আর সেই সমাজকে ধারণ করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার তাগিদও তিনিই দিয়ে গেছেন। নিজে বিশ্বভারতীর মতো খোলা জানালার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে চেয়েছেন। আর সারা বিশ্ব থেকে তিনি শিক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করেছেন নিরন্তর।

তিনি তাঁর আধুনিক অনুভূতি ও বিশ্বভাবনা দিয়ে আমাদের শিল্প ও সাহিত্যকে এমন সমৃদ্ধ করে গেছেন বলেই আজ আমরা জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে চলতে পারছি। আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির ভিত্তিও রবীন্দ্রনাথই গড়ে দিয়ে গেছেন। হালে বাংলা নববর্ষকে কেন্দ্র করে সমাজের ভেতরে যে শুভশক্তির বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে তার ইতিবাচক প্রভাব শিল্প-সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ওপর পড়তে শুরু করেছে। বিশেষ করে তরুণ সমাজের পহেলা বৈশাখ উদযাপন আমাদের অনেকটাই আশাবাদী করে তুলেছে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারাবিশ্বেই বাঙালির এই শিকড়-সন্ধান সত্যি আশা জাগানিয়া এক প্রবণতা। তবে এ কথাও ঠিক তাঁর পুবদেশীয় সমাজভাবনাকে গুরুত্ব না দিয়ে হালে আমরা কোনো রকম বাছবিচার না করেই পশ্চিমের সংস্কৃতিকে কোনো বাছবিচার না করেই আঁকড়ে ধরছি। ধীরে ধীরে আমাদের সন্তানদের স্বদেশের সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি থেকে উন্মুল করে ফেলছি। দিন দিন তারা তাই আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা হারিয়ে দিকহারা এক উন্মুল প্রজন্মে রূপান্তরিত হচ্ছে। সংস্কৃতির এই ইতি ও নেতিবাচক দোলাচলে আমাদের আরও বেশি সতর্ক হতে হবে। বিশ্বায়নের এই অস্থির সময়ে আমাদের সমাজের স্বকীয়তাকে অবশ্যই খুঁজে পেতে হবে। এক্ষেত্রেও মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষা আমাদের সেই স্বকীয়তা অর্জনে সাহায্য করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি-চিন্তা ও তাঁর প্রয়াসে আন্তরিক হলে এমন সাংস্কৃতিক সংকটে আমাদের হয়তো পড়তে হতো না। তার মানে এই নয় যে, আমরা বিশ্বসংস্কৃতির ইতিবাচক দিকগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব। রবীন্দ্রনাথ কখনও তেমন করে বিশ্বকে দেখতেন না। বরং তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালি এবং একই সঙ্গে বিশ্বনাগরিক। স্বদেশের শক্ত সাংস্কৃতিক জমিনে দাঁড়িয়েই তিনি বিশ্বসংস্কৃতির সুবাতাস গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন। সেজন্য তিনি ভ্রমণও করেছেন বিশ্বজুড়ে। আর সেই ভ্রমণলব্ধ জ্ঞানের আলো দু'হাতে ছড়িয়েছেন এই বাংলায়।

সকল উৎস থেকে মানবিক সদ্‌গুণ আহরণের প্রক্রিয়ায় নিরন্তর যুক্ত থেকে তিনি বাঙালির মনকে বিশ্বমনে রূপান্তর করতে চেয়েছিলেন বলেই আমাদের রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি হতে পেরেছিলেন। বিশ্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের দুঃখের কারণগুলোকে যে আমাদের খুঁজে পেতে হবে, সে কথা তিনি বারে বারে বলে গেছেন। তাই তাঁর উদারনৈতিক মানবিক, সৃজনশীল আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভাবনার পরশ পাই তাঁর নানা লেখায়, গল্পে, কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, নৃত্যকলায়, বক্তৃতায়। সবক্ষেত্রেই দেখতে পাই সাধারণের জন্য তাঁর পক্ষপাতিত্ব। আর সে কারণেই তাঁর এসব গভীর ভাবনাকে আমরা চাইলেই যুক্ত করতে পারি আমাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ভাবনায়। আমাদের দেশটাকে আমরা আমাদের স্বদেশি ভাবনার আলোকেই উন্নত করতে চাই। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে সেটিই স্বাভাবিক, এমনটিই হওয়ার কথা।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তথা সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও অর্জনের জন্য চাই তেমন গুণমানের শিক্ষা। চাই আধুনিক বিশ্বের উপযোগী উদারমনা দক্ষ মানবশক্তি তৈরির শিক্ষা। চলমান এই সভ্যতার সংকটকালে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনার আলোকে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন খুব করে অনুভব করছি। মানুষে মানুষে সম্পর্ক গড়ার যে আহবান রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে জীবন সাহাহ্নে এসে রেখেছিলেন, তা আজও একইভাবে সত্যি।

'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো যে পাপ'-কবিগুরুর সেই অমোঘ সত্যিকে মাথায় রেখেই আমাদের ফের জাগতে হবে। আমাদের আবার ঘুরে দাঁড়াতে হবে, সব অপশক্তিকে রুখে দিতে হবে। অতীতে অনেক সংকটকালে আমরা এক হয়েছি এবং অশুভ শক্তিকে পরাজিত করেছি। ভুলে গেলে চলবে না, এই আমরাই সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি এবং পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর সামাজিক আকাঙ্খার আলোকে অনেক সাহসী উদ্যোগ নিয়ে আমরা ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি। তাহলে এখন কেন আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির মঙ্গলশক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে চলমান ক্রান্তিকালের উত্তরণ ঘটাতে পারব না? নিশ্চয় পারব। এই আমরাই তো পহেলা বৈশাখের ভোরে রমনার বটমূলে সমবেত হচ্ছি, মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে অশুভ শক্তিকে তাড়া করছি। তাই সবাই মিলে একটি জাতি হওয়ার নিরন্তর সচেষ্ট প্রচেষ্টা এখনও চালিয়ে যেতে হবে। মানুষের মতো মানুষ হওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে। নিজেদের ঐতিহ্য ও অর্জনের পাটাতনে দাঁড়িয়েই আমাদের আরও বিরাট স্বপ্ন দেখতে হবে এবং সেই স্বপ্নের সমান হওয়ার ভরসা রাখতে হবে।

Nano Materials – What These Are and Their Applications

Professor Dr Jahangir Alam
Head, Department of CSE and ETE

Nano-particles (NP's) have great potential application for biomedical, electrical and so many other fields mainly due to recent development in research activities throughout the world. In general particles with a size of 100 nanometers are labeled as nano-particles. Although the research activities are at a much higher level now compared to the level it were even a few years back. History shows that the application of nano-materials were in existence and practiced by the Egyptians using gold nano-materials to make gold plated ivory for the Pharaos thousands of years back (8th century BC, Louvre collection originated from Arslan,Tash, Syria). The 4th-century Roman Lycurgus Cup appears red when illuminated from behind and green when illuminated from the front (British Museum). It is now clear that these brilliantly colored artifacts were created by very thin coatings of powders of gold, sized with almost nano sized particles. Thus, Au NPs have been found in products made by humans for thousands of years also.

During the past 20 years, the numbers of applications of nano and micro devices in the fields of biotechnology and biomedicine have been increased to a significantly high level. Actually it is very common to find products in our laboratories basedon nano-technology for applications such as cell separation, catalysis, supports,labeling, etc. Fromall of those nano-devices developed the most popular and most used are probablythe nano-particles. In fact, during the past years, some nano-systems have been approved by FDA (Federal Drug Administration, USA) for their use as contrast agents or drug delivery devices. A group of newest characterizing process used to detect some chemical groups precisely,the techniques of SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) using gold nano-particleswere found very successful.

But, what is the main reason, why does theresearcher focus on these nano-particles andwhy has these been developed so fast? Probably,the main reason is the fast development of characterization techniques during the past few years. New electronic microscopes, more precise,

with better resolution,and easy to manipulate, have been developed to improve and simplify the characterization of nano-particles.All of these make the production and characterization of the new nano-structures and these make easier ways for getting a better understanding of the mechanisms that control the growing processes for driving their formation. Once the synthesis of different sizes and shapes of organic and inorganic nano-particles has been understood and are under control. Being interested for biotechnology the number of applications grew very fast and those are the reasons why neno particle research is also so important. There are a few other aspects that we take into consideration. One of the attractive properties of the nano-particles is the high specific surface area that these nano-particles have.

This larger surface area allows the accommodation of a high concentration of drugs or required molecules in them. In the case of inorganic nano-particles, due to their nano-metric size, nano-particles have interesting physical properties such as different fluorescent or magnetic properties. The uses of these properties allowed the development of most sensitive and selective biosensors, new therapy approaches and also merge diagnosis and therapy in the same device. The detection of pathogenic bacteria is the key to many problems related to health and safety. Many detection methods involve culturing bacteria and may take up to 7 or 8 days to yield an answer which is clearly inadequate in many healthcare and food preparation settings. Consequently, many efforts have been made toward the development of rapid detection methods for bacteria.

Lithium ion batteries are widely used as rechargeable cells in any appliances especially in cell phones. China has the highest Lithium reserve in the world. To reduce the dependence on the use of Lithium, intensive research is going on to develop electrical energy storage devices such as electrochemical capacitors, aka super capacitors. These are unique in terms of high power density, high charge-discharge cycle, life and wide temperature range operations. Among various electrical energy storage devices, rechargeable batteries, flow batteries, ultra-batteries, super capacitors, also called electro chemical capacitors, stand out the best devices for energy storage because of their high specific power (>10 $kW\ kg^{-1}$), long life time and fast charge discharge process. Research showed that the surface morphology affects the electro capacitive behavior of the electrodes. The study suggests a guide for optimizing the electro capacitive behavior of electrodes via alteration of

their morphology and shape. The electrochemical stability, excellent capacitive performance, and the easiness of the preparation method suggest that Co_3O_4 based materials are promising for high performance energy storage devices. Recently published research paper showed that in the nano-sized regime, Co_3O_4 has high surface area and enhanced electrochemical reactivity and is therefore expected to lead to even more attractive applications, in conjunction with its traditional uses. The challenges in nano-crystal synthesis are to control the crystal size as well as shape and morphology and to prevent particle agglomeration and controlled growth of nano-particles. Nano-scale materials have found broad application in industrial processes, consumer products, therapeutics, and diagnostics as well. In each application, the driving force for nano-particle use lies on the unique size-dependent chemical or physical properties, including catalytic, electrochemical, electron transport, magnetic, optical, and thermodynamic behaviors. Magnetic nano-materials are important source of labels for bio sensing due to their strong magnetic properties, which are not found in biological systems. Modulation of the composition, size, and magnetic properties of these materials permit their use in a variety of instruments and formats for biosensors making it a very promising sensor system in medical biotechnology.

তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) শিক্ষা: বাস্তবতা ও পথ নির্দেশনা

মোঃ আশরাফুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ
ও
সহকারী প্রোক্টর

একটা মানুষের মধ্যে দুইটা সত্তার বসবাস। শারীরিক গঠন একরকম, অন্যদিকে মনের সত্তা আরেক রকম। শুধু তার শারীরিক গঠন দেখেই তাকে বিচার করা যাবে না। যেমন সে দেখতে ছেলেদের মত, কিন্তু তার মন চায় মেয়েদের মত ড্রেস পরতে, মেয়েদের মত সেজেগুজে থাকতে।

পুরুষ, মহিলা এবং তৃতীয় লিঙ্গ সবাই মানুষ। জন্মগতভাবে সবার সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও বিনোদনের অধিকার রয়েছে। তাহলে এই হিজড়া জনগোষ্ঠী কেন তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত? আমাদের সমাজে তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) মানুষদের পছন্দ করা হয় না এবং সামাজিকভাবে তাদের অবস্থান ভালো নয়। সমাজ তাদেরকে খারাপ চোখে দেখে, অপরাধী হিসেবে গণ্য করে। সামাজিকভাবে তাদের হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। ধরেই নেয়া হয় যে, ভিক্ষাবৃত্তি এবং নাচ গানের মাধ্যমে নবজাতকদের আশির্বাদ করে টাকা উপার্জন করার জন্যই হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্ম। পথেঘাটে আমরা দেখতে পাই হিজড়াদের দেখে সমাজের অন্য মানুষরা ভীত এবং বিরক্ত। এই জনগোষ্ঠীর পিছিয়ে পড়ার পেছনে আসলে দায়ী কারা? তাদের ভিক্ষাবৃত্তি বা সমাজে নিচু অবস্থানের পেছনের কারণ বা দায়ী কারা?

বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ সরকার একীভূত শিক্ষায় জোর দিচ্ছে। একমাত্র শিক্ষাই পারে মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে। হিজড়াদের যদি সমাজে অন্যান্য মানুষের সাথে একীভূত করতে হয় তবে তাদের শিক্ষার সুযোগ প্রদান এবং তা চলমান রাখার ব্যবস্থা করা অতীব প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সরকার মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ২০১৫ অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকরণে অনেকাংশে সফল বলা চলে, কিন্তু তা ধরে রাখাটা এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চার নম্বর লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য মানসম্মত সমতাভিত্তিক ও অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় উৎসাহ দানের কথা বলা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায়, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের স্কুল প্রবেশের পথে কোন বাধা নেই, এরা স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। কিন্তু একটি পর্যায়ে যেয়ে তারা ঝরে পড়ছে স্কুল থেকে। যখন তারা স্কুলে ভর্তি হয়, তখন তাদের আচরণ অন্যান্য শিশুদের মতই থাকে। সুতরাং স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে তাদের কোন সমস্যা হয় না।

সমস্যা শুরু হয় যখন তাদের আচরণের কিছু পার্থক্য দেখা দেয়। গবেষণা থেকে দেখা যায়, তাদের আচরণগত পার্থক্যের কারণে তাদেরকে বাজে মন্তব্য করা, শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন করা, অর্থনৈতিক সমস্যা, পরিবার, শিক্ষক, সহপাঠী ও সমাজের সহযোগিতার অভাবে তারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বেশি ঝরে পড়ে। এমনকি তারা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। সহপাঠীরা বাজে মন্তব্য করার পর শিক্ষকের কাছে বিচার নিয়ে গেলে, শিক্ষক উল্টো তাদেরকেই বকা দেয়। যেমনঃ

> একজন তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন এবং তার ভ্র প্লাক দেখে কিছু সহপাঠি তাকে হাফ লেডিস বলে ডাকে এবং তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাত দেয়। তখন শিক্ষকের কাছে বিষয়টি জানানো হলে উল্টো শিক্ষক তাকে বকা দেয় এবং বলে কাল থেকে তুই সালোয়ার কামিজ পরে স্কুলে আসবি।

এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীরা সহপাঠী, শিক্ষক এবং অফিস স্টাফদের দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়ে থাকে। একজন শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়ানোর কথা বলে বাসায় নিয়ে অনৈতিক কাজ করতে চায়। পরবর্তীতে সে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে পরিবার তাদের পিছনে অর্থ খরচ করাটা অপচয় মনে করে। এজন্য অনেক পরিবার আর্থিক সহযোগিতা বন্ধ করে দেয় বলে তাদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়।

গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশ হতে দেখা যায়, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হিজড়াদের জন্য বেশি উপযোগী। বিশেষ করে ঝরে পড়া হিজড়াদের রান্না, সেলাই, বিউটি পার্লার ইত্যাদি কাজে বেশি আগ্রহ। এছাড়া অন্যান্য সুপারিশ সমূহ হল :

- একীভূত শিক্ষার উপর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন ।
- সমাজের সকল মানুষদের সচেতন করার জন্য টেলিভিশন এবং অনলাইনে সচেতনামূলক প্রচারণা কার্যক্রম চালানো উচিত।
- সকল শ্রেণিতে পাঠ্যপুস্তকে একটি চ্যাপ্টার সংযোজন করা প্রয়োজন তৃতীয় লিঙ্গসহ সুবিধাবঞ্চিত/হিজড়া জনগোষ্ঠীর উপর যাতে শিক্ষক, সহপাঠী, অভিবাবক সবাই সচেতন হয়।
- প্রতিটি স্কুলে আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা থাকা উচিত। কেননা তারা বুঝতে পারে না ছেলে/মেয়ে কোন টয়লেটে তারা যাবে।
- স্কুল থেকে শুরু করে সকল ভর্তি ফর্মে পুরুষ, মহিলার পাশাপাশি তৃতীয় লিঙ্গে টিক দেওয়ার অপশন রাখা উচিত।
- তাদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।
- হিজড়াদের থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশসহ হোস্টেল নির্মাণ করা উচিত।
- বিভাগীয় শহরে হিজড়াদের জন্য আলাদা আবাসিক সুবিধাসহ টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন ।
- উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে এবং মানুষ হিসেবে তাদের যথাযথ সম্মান দিতে হবে।

একমাত্র শিক্ষাই পারে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন

করতে, সেই সাথে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে। শিক্ষা যেমন সচেতনতা তৈরি করবে তেমনি জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চাকুরীর পথ প্রসারিত হবে এবং তাদের সামাজিক অবস্থান ও জীবনমানের পরিবর্তন ঘটাবে। মানুষ হিসেবে সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা এবং সম্মান পাওয়ার তাদের অধিকার রয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সামনে আনার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করতে হবে।

সবশেষে আবারো বলতে চাই, তৃতীয় লিঙ্গ, মহিলা, পুরুষ সবাই মানুষ।

আমি যেন রাস্তায় হিজড়াদের দেখে ভয় না পাই বা বাজে মন্তব্য না করি
হিজড়ারাও যেন আমাকে দেখে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যরকম আচরণ না করে
ভয় না দেখায় বা অপমানিত না করে
আমার এবং হিজড়াদের সকলের প্রয়োজন গুণগত শিক্ষা ও সচেতনতা
সেই সাথে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা

Fakir Lalon Shah's Philosophy of Religion: An Introspection from His Famous Songs

Alaul Alam
Lecturer in English
Prime University Language School

Fakir Lalon Shah's religious thinking was fully concealed but deeply rooted in connection with humanity and the worship of human being straced from his songs. If we look at the community where Lalon was born, was full of confusion and chaos and no authenticity of religion, rather a biasness was existing under the name of religion. According to Lalon researchers, he had to go through huge mental agonies observing the prevailing sceneries of his belonging communities. Dr. Anwarul Karim, one of the Lalon researchers in the present time stated in his writing that during his boyhood, Lalon went for a holy bath with his village companions and on returning from the pilgrim he was attacked with small pox. His companions thought him dead and threw his body into Kali River. When his floating body reached the shore of a locality, the wife of Malam Shah discovered the body alive and brought him to her house where he was given motherly affection by Motijan Bibi (wife of Malam Shah). When he was restored to health, he returned to his native village and his wife and mother were so happy to see him but the society did not allow him to live with his family, rather he was compelled to leave the community because he took food and shelter from a Muslim family. That incident gave him a great shock as well as a message that was religious disharmony among the people with different religions.Lalon sings in one of his songs,

"Fikiri korbi khapa ....
Jekhane hindu muslim dui vage"

Studies show that religion is a personal belonging of an individual of every community by which he thinks himself different from the people of other religions and the issue of thinking about religion makes people chained with the boundary within their own community. Besides, the followers of each religion from the time immemorial have been performing the rituals according to their beliefs to get the salvation or to be free from sins. Lalon's philosophy of religion was totally different from the existing ideology regarding religion. He believed in Baulism

that made a great path to serve the humanity through his oral songs. He believed that no religion should be followed where humanity is denied or neglected. According to Lalon, human beings should be the center of any religion and one of the folklorists, Professor Dr. ShahinoorRahman stated in one of his studies that Lalon was capable of establishing humanitarian spirit by preaching his doctrine regarding religion among his disciples. Throughout his life he was a relentless devotee whose only aim was to search the spirit of infinity within the inner self. To search Moner Manush or Inner Self was the philosophic aspect of his songs. The very famous song of Lalon Fakir in the following is about to search the inner self.

"Kachar vitor ochin pakhi
Komne ase jai
Tare dharte parle mono beri
Ditam pakhir pay."

This song reveals that Lalon believed in inner spirit in terms of identifying the Almighty. There is a query of Lalon Fakir that how the mysterious bird comes inside and goes outside of the cage. Here the bird is considered human soul, the cage as human body. In this song, Lalon is interested to have the inner spirit into himself and it is his earnest desire to know the bird and to pet it into his self.
According to Lalon Shah, souls reside within the body and after realizing this truth, Lalon expressed his idea through this famous song:

"Barirpase Arsi Nagor
Setha ak Porsi Bosot Kore
Ami akdino na dekhilam tare."

In searching of 'Moner Manus' Lalon did not get himself engaged in any so called religion , rather he went beyond the religious, communal and racial conflicts and believed in the humanity where there will be no religious and racial conflicts The following song bears the philosophy of Lalon's religion:

"Amon samaj kobe go srijon hobe,
jedin hindu muslim boudhho christian
jati gotro nahi robe"

Lalon in his song earnestly desired such a society where Hindu, Muslim,

Buddha and Christian would live together with peace and harmony. He witnessed that traditional religious believe could nothing but to create chaos and instability in the community. He manifests himself as an icon of the world to establish a universal religion where human beings will get the right path for salvation. He sang this song out of his mental agony observing the prejudices of the people of that time. Lalon's philosophy of religion is to discover the inner self of every individual and that is urgent to be purified from all kinds of sins. He dreamt to unite all the people of the communities under a single humanitarian stand which is no doubt, beyond the limit of material pleasure. In another song,Lalon sings,

"Jatgalo jatgalo bole
Aki ajob karkhana"

In this famous song, Lalon expressed his outpouring emotion and feelings towards the then society and community in which different religions used to be followed by the people of different classes and faiths and they used to get huge emphasis on the performance of the rituals of religion from the very surface not realizing the basic conception of religion, similarly all the concentrations remained associated with the religious divisions of the people in general.But according to Lalon, God or Allah is universal and not far away from the self of human beings. In one of his songs, Lalon says,

"Dube dakh dekhi mone kirup lilamay
Akash-patal khujish jare, ai dehe se roy."

So heart is the place where God resides and it should be the ultimate aim of the human beings to establish connection with (Almighty) Moner Manus, then the life of human beings will be glorious.
Through his famous song, he asks

"Asber kale kijatchile
Ase tumi ki jatnile
Ki jat hobe jabar kale
Se kotha bhebe bolo na"

When people take birth, do they bear any sign of religion? or when they depart from this world , do they say which religion they will bear ? And most interesting to say that the people from different religions make them purified using the same water. So, the question of differentiating among

the communities makes Lalon confused in terms of the existing religion. Here we see that Lalon's philosophy of religion lies in a unique religion, that is, all the people of the world will stand under the single platform where there will be no division, no conflict among the people. In one of his songs, Lalon clarifies his philosophy regarding religion and he thinks that religion is concerned with humanism that expresses in the following song of Lalon Fakir,

"Manush vojle sonar manush hobi
Manush chara khapa re tui kul harabi .....

In this song, Lalon stated that there is no religion except humanism. According to him, religion resides in serving the humanity. But the people of the so called society follow a trend of showy religion that does not give them right path to be universalized. Here Lalon earnestly requests the mankind to own and respect the humanity and that will make him reach in the right track of religion and people will get the taste of infinity in order to have a connection with the inner self.

Finally, it is pointed out that Lalon's philosophy of religion certainly focuses and purifies human heart with an enlightenment which became spread universally and so Lalon had been a universal figure. If we could follow the ideology of humanism, there would be no chaos and conflict which Lalon longed for many years back. To establish a society with equity and equality was the real purpose of his religion which still are needed to live with peace and harmony in the world.

প্রাইম ইউনিভার্সিটি প্রাইম কেন?

আনোয়ার হোসেন
সহকারী রেজিস্ট্রার

প্রাইম ইউনিভার্সিটি দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা দেশের প্রয়োজনের সাথে সমন্বয় করে মানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের জন্য নিবেদিত। বিশ্ববিদ্যালয়টি ২০০২ সালে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের স্বনামধন্য কিছু শিক্ষাবিদ, মানবপ্রেমী ও ব্যবসায়ীদের একটি গ্রুপ উচ্চ শিক্ষার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি বাংলাদেশ মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) ও বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত। প্রাইম ইউনিভার্সিটি ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আধুনিক বিশ্বের চাহিদানুযায়ী মানবসম্পদ গড়ে তুলতে সচেষ্ট। ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রাইম ইউনিভার্সিটি সম্প্রতি নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে (১১৪/১১৬, মাজার রোড, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬) স্থানান্তরপূর্বক আরো দৃঢ়তার সাথে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

আধুনিক শিক্ষার সব সুযোগ সুবিধা নিয়ে স্থাপত্যশৈলীর স্থায়ী ক্যাম্পাস তৈরী করেছে প্রাইম ইউনিভার্সিটি। ঢাকার সব দিক থেকেই প্রবেশের উপযোগী এই মাজার রোডে পর্যাপ্ত সবুজ এলাকায় তৈরী করা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনটি পুরোটাই ওয়াইফাই জোন হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য রয়েছে পৃথক ইন্টারনেট সংযুক্ত সুপরিসরে শ্রেণীকক্ষ ও মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ ক্লাসরুম। প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে রয়েছে দ্রুত গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট ব্রাউজিং ল্যাব যেখানে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য রয়েছে পৃথক কম্পিউটার সহ আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা।

প্রাইম ইউনিভার্সিটির নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনার জন্য রয়েছে দক্ষ ট্রাস্টি বোর্ড। বোর্ড অব ট্রাস্টিজের বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মীর শাহাবুদ্দিন। তিনি প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে ম্যাজিস্ট্রেট, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, এডিএলজি, মহকুমা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (ডিসি), মহাপরিচালক (সমাজ সেবা অধিদপ্তর), মহাপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর), বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদায় অবসর গ্রহণ করেন।

প্রাইম ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রফেসর ড এম আব্দুস সোবহান। তিনি এই ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্যও ছিলেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাবেক অধ্যাপক, কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিসিসি এর সাবেক নির্বাহী পরিচালক ও ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (আই ইউ বি) এর ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। "a home for rendering prime knowledge" এই শ্লোগান নিয়ে প্রাইম ইউনিভার্সিটি নির্ভীক এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রাইম ইউনিভার্সিটি বর্তমানে ৫ টি অনুষদের মাধ্যমে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

অনুষদ	বিভাগ	বিভাগ
কলা ও মানবিক অনুষদ	ইংরেজী	* ৪ বছর মেয়াদী বিএ (অনার্স) * ১ বছর মেয়াদী এমএ * ২ বছর মেয়াদী এমএ (প্রিলি এন্ড ফাইনাল)
	এডুকেশন	* ১ বছর মেয়াদী বি এড * ১ বছর মেয়াদী এম এড
ব্যবসায় অনুষদ	ব্যবসায় প্রশাসন	* ৪ বছর মেয়াদী বিবিএ * ১ বছর মেয়াদী এমবিএ * ১৬ মাস মেয়াদী এক্সিকিউটিভ এমবিএ * ২ বছর মেয়াদী রেগুলার এমবিএ
	বিজনেস ইনফরমেশন সিস্টেম	* ৪ বছর মেয়াদী বিবিআইএস
ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ	কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	* ৪ বছর মেয়াদী বিএসসি ইন সিএসই
	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	* ৪ বছর মেয়াদী বিএসসি ইন ইইই
	ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং	* ৪ বছর মেয়াদী বিএসসি ইন ইটিই
তথ্য প্রযুক্তি অনুষদ	কম্পিউটার সাইন্স	* ৪ বছর মেয়াদী বিএসসি ইন সিএস
আইন অনুষদ	আইন বিভাগ	* ৪ বছর মেয়াদী এলএলবি অনার্স * ২ বছর মেয়াদী এলএলবি (প্রিলি এন্ড ফাইনাল) * ১ বছর মেয়াদী এলএলএম (রেগুলার) * ২ বছর মেয়াদী এলএলএম (প্রিলি এন্ড ফাইনাল)

ব্যবসায় অনুষদ প্রাইম ইউনিভার্সিটির একটি সমৃদ্ধ অনুষদ। বর্তমানে ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের বিবিএ, এমবিএ ডিগ্রিধারীদের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র। প্রাইম ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েটেরা দেশীয় ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষপদ দখল করে আছে। চাকরির বাজারে বিবিএ, এমবিএ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাংক-বীমাসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর হিসাব বিভাগ, নিরীক্ষা বিভাগ, ট্যাক্স বিভাগ, প্রশাসন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিভাগগুলোতে কাজের সুযোগ রয়েছে। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে নানা পরিবর্তন নিয়ে আসছে। প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ ও এমবিএ তে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই ছাত্র ছাত্রীরা নিজেকে গুছিয়ে

নেওয়ার সব ধরনের পরিবেশ পায়। প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে রয়েছে অভিজ্ঞ ও যোগ্যতা সম্পন্ন পূর্ণকালীন শিক্ষক। এছাড়াও আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের খন্ডকালীন পাঠদান। সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট, ওয়াইফাই সুবিধা এবং আবাসিক সুবিধা।

প্রাইম ইউনিভার্সিটি প্রত্যেক সেমিষ্টারে অ্যাসাইনমেন্ট, প্রেজেন্টেশন এবং বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে এতে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস অনেকাংশেই বেড়ে যায় এবং কর্মস্থলে সাফল্যের সঙ্গে নেতৃত্ব দিতে পারে।

ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইম ইউনিভার্সিটির একটি অন্যতম অনুষদ। তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবের এই যুগে ইঞ্জিনিয়ারিং লেখাপড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিক্ষার সব স্তরে কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনি ইঞ্জিয়িারিং, ইলেকট্রনিক এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমানে সফটওয়্যার ডেভেলপার, ওয়েব ডেভেলপার, আইটি ম্যানেজার, কম্পিউটার প্রোগ্রামার, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, কম্পিউটার সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, কম্পিউটার সিস্টেম অ্যানালিস্ট, ইনফরমেশন সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট, ডাটাবেজ অ্যাডমিন এছাড়া প্রায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে এখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেল খোলা হয়েছে। সেখানেও সিএসই, ইইই, ইটিই ইঞ্জিনিয়ারিংদের প্রাধান্য রয়েছে। প্রাইম ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছাত্রীরা এ সকল ডিপার্টমেন্ট হতে বিএসসি ডিগ্রী অর্জন করে বিসিএস ক্যাডারসহ দেশ ও দেশের বাহিরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিয়েছে। অনেকেই আইবিএম, মাইক্রোসফট, গুগল ও স্যামসাং এর মতো বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ পাচ্ছে এবং অনেক শিক্ষার্থী বিএসসি শেষ করেই মোবাইল ফোনসহ বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে আইটি প্রফেশনাল হিসেবে ভালো বেতনে কাজ পেয়ে যাচ্ছে। প্রাইম ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এ রয়েছে ৫০ জনের অধিক নিয়মিত শিক্ষক এছাড়াও বুয়েট, ডুয়েট, চুয়েট, রুয়েট, কুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খন্ডকালীন শিক্ষক।

প্রাইম ইউনিভার্সিটির আইন অনুষদ বাংলাদেশের সুপরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ অনুষদ। বিশ্বে সম্মানজনক পেশাগুলোর মধ্যে অন্যতম আইন পেশা। আইন বিষয়ে শিক্ষা প্রসারে বর্তমানে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োজিত রয়েছে তার মধ্যে প্রাইম ইউনিভার্সিটি অন্যতম। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে ছাত্র ছাত্রীরা এখানে লেখাপড়া করার সুযোগ পায়। আইন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে এখানে আইনের অধ্যাপক, আদালতে কর্মরত আইনজীবী, বিচারক, ব্যারিস্টার প্রমুখের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী শিক্ষক প্যানেল তৈরি করা হয়েছে। খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে এখানে কর্মরত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ। এখানে নিয়মিত আইন বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনার, ছাত্র ছাত্রীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কোর্ট ভিজিট ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়ে থাকে। গ্রাজুয়েটরা যখন এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রী গ্রহণ করে থাকে তখন পুঁথিগত জ্ঞানের পাশাপাশি আদালতে প্রাকটিশনার হিসেবে কাজ শুরু করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। আইন বিষয়ের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ ও রেফারেন্স বই প্রাইম ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে আছে। লাইব্রেরি কার্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় বই নিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় সাফল্য হচ্ছে বিগত ১ দশক ধরে এ

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছাত্রীরা বার কাউন্সিল পরীক্ষায় প্রায় শতভাগ পাশ করে আসছে। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশকৃত কয়েক সহস্র আইনজীবী দেশের সর্বোচ্চ আদালত সহ বিভিন্ন বার অ্যাসোসিয়েশনে আইনজীবী হিসেবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আইন পেশায় নিয়োজিত আছেন। বিচার বিভাগের বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে উল্লেখযোগ্য ছাত্র ছাত্রী কর্মরত আছেন।

প্রাইম ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগ ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং এই বিভাগের বি এ অনার্স ও এম এ ইন ইংলিশ প্রোগ্রামের লেখাপড়া দিনদিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিশেষ করে পরিকল্পিত কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষা দানের দক্ষতা ও কৌশলগুলি প্রদান করা হয়। এই ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েটেরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স সম্পূর্ণ করে বিসিএস ক্যাডারসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া ইংরেজী বিভাগের নিয়মিত শিক্ষকদের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে এখানে নিয়োজিত আছেন।

প্রাইম ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় ও যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের গুরুত্ব অপরিসীম। বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে গুণগত, মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী শিক্ষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে সেমিস্টার পদ্ধতিতে এক বৎসর মেয়াদী উইকএন্ড কর্মসূচীর আওতায় প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে বিএড এবং এমএড কোর্সের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যার মূল উদ্দেশ্য হল মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে বিএড এবং এমএড প্রোগ্রামে অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা স্বল্প খরচে গুণগত ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়া দেশের ও দেশের বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে বিএড ও এমএড প্রোগ্রামে লেখাপড়া করছে।

প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে রয়েছে ২২টির মতো বিভিন্ন ধরনের ক্লাব যার মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক, সামাজিক কর্মকান্ড সহ মানসিক মেধা বিকাশের সুযোগ পেয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য ক্লাবগুলোর মধ্যে আছে ডিবেটিং ক্লাব, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, কালচারাল ক্লাব, স্পোর্টস ক্লাব (আউটডোর), স্পোর্টস ক্লাব (ইনডোর), ফটোগ্রাফি সোসাইটি, হেলথ ক্লাব, ক্যারিয়ার এন্ড জব প্লেসমেন্ট সোসাইটি, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ক্লাব, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ক্লাব, মুট কোর্ট সোসাইটি, ভলেন্টিয়ার সার্ভিস ক্লাব, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাব, বিএনসিসি এন্ড স্কাউট, বুক সোসাইটি, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট সোসাইটি, সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাব, আইইইই স্টুডেন্টস ব্রাঞ্চ, বিজনেস স্টাডিস ক্লাব, কুইজ কম্পিটিশন, ড্রামা সোসাইটি ক্লাব অন্যতম।

ইঞ্জিনিয়ারিং লেখাপড়ার জন্য ল্যাবরেটরি খুবই অপরিহার্য। প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য রয়েছে ৩০ টির মতো বিভিন্ন ধরনের সুসজ্জিত ল্যাব তার মধ্যে টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরি, সার্কিট ল্যাবরেটরি, ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স ল্যাবরেটরি, অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স ল্যাবরেটরি, কম্পিউটার ল্যাবরেটরি, ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল ল্যাবরেটরি, মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরি,

সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরি, অপারেটিং সিস্টেম ল্যাবরেটরি, ভিএলএসআই ল্যাবরেটরি, ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল এন্ড পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স ল্যাবরেটরি, ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং ল্যাবরেটরি, ডাটা কমিউনিকেশন ল্যাবরেটরি, কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ল্যাবরেটরি, ফিজিক্স ল্যাবরেটরি, কেমিষ্ট্রি ল্যাবরেটরি, ওয়েব প্রোগ্রাম ল্যাবরেটরি অন্যতম।

প্রাইম ইউনিভার্সিটির শিক্ষাক্ষেত্রে এখন দেশ পেরিয়ে বিদেশেও বিস্তৃত হয়েছে। প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বিভিন্ন দেশের ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন প্রোগ্রামে লেখাপড়া করছে এবং প্রতিনিয়তই নতুন ছাত্র ছাত্রীরা লেখাপড়ার জন্য আসছে। নেপাল, সোমালিয়া, জিম্বাবুয়ে, ঘানা সহ বিভিন্ন দেশের ছাত্র ছাত্রীরা এখানে আছে। বিদেশি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডেস্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে তারা তাদের সকল কাজ অতি সহজেই সম্পাদন করতে পারে। প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীর লেখাপড়াসহ অন্যান্য বিষয়ে দেখাশুনার জন্য একাডেমিক এডভাইজার নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ছাত্র ছাত্রীদের জন্য রয়েছে হোস্টেল সুবিধা।

প্রাইম ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের স্কলারশীপ ও আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। মেধাবী ও গরিব, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও নাতি-নাতনি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, ভাই-বোন (১জন), স্বামী-স্ত্রী (১জন), স্বীকৃত খেলোয়াড় ও সাংস্কৃতিক কর্মী এবং উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের ১০০% পর্যন্ত টিউশন ফি মওকুফ করা হয়। এছাড়াও মেয়েদের অতিরিক্ত ৫% টিউশন ফি মওকুফ করা হয়।

প্রাইম ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি (পি.ইউ.ডি.এস) যাত্রা শুরু করেছিল ২০০৭ সালে। প্রতি সেমিস্টারেই ''বিতর্কের জন্য প্রতিভা অন্বেষণ" বলে একটা ট্যালেন্টহান্ট হয় সকল বিভাগে। ডিবেটিং সোসাইটি মূলতঃ টেলিভিশন বিতর্ক (যেমন এটিএন বাংলা, বিটিভি), বিভিন্ন সংগঠন/সংস্থা (টিআইবি, জাতীয় মানবাধিকার সংগঠন, ন্যাশনাল ডিবেটিং ফেডারেশন, বাংলাদেশ, ন্যাশনাল ডিবেটিং ফেডারেশন, ব্রিটিশ কাউন্সিল) কর্তৃক আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতা (জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অংশ গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে প্রায় প্রতি সেমিস্টারেই বিতর্ক কর্মকান্ড অনুষ্ঠিত হয় (নবীন বরণ অনুষ্ঠানে রম্য বিতর্ক, আঞ্চলিক বিতর্ক)। বিভিন্ন টক শো অনুষ্ঠান (আর টিভির রোড টু ইলেকশন অনুষ্ঠানে সোসাইটির ৬জন বিতার্কিক তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ গ্রহণ করে)। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠানে (প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অভিবাসী কল্যাণ বিষয়ক সভায়) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা প্রতিনিধি হিসেবে অংশ গ্রহণ করে। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শো, ডিবেট, সামাজিক সচেতনতামূলক বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে। প্রাইম ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে বিতর্ক বিষয়ক বইয়ের একটি বিশেষ কর্ণার রয়েছে যেখানে এ বিষয়ে অনেক বই রয়েছে। শিক্ষার্থীরা চাইলেই সেই বই নিয়ে পড়তে পারে। প্রতি বছর ডিবেট কমিটির পক্ষ থেকে একটি বাজেট পেশ করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই বাজেটের বহুলাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে বহন করেন।

ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড খুবই অপরিহার্য। প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছাত্র ছাত্রীরা

এ সকল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের মেধা বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে। ছাত্র ছাত্রীদের এ সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি কালচারাল কমিটি রয়েছে যারা তাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে থাকে। প্রাইম ইউনিভার্সিটি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বার্ষিক বনভোজন, শিক্ষা সফর, ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ভিজিটসহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। ছাত্র ছাত্রীরা দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন ও ভ্রমণের সুযোগ পায় যা তাদের বিনোদন এর ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক।

প্রাইম ইউনিভার্সিটি প্রতি বছরই বার্ষিক প্রতিবেদনের পাশাপাশি গবেষণামূলক সাম্মাসিক জার্নাল যথাসময়ে প্রকাশ করছে। তাছাড়াও 'The Ray' নামে একটি বার্ষিক ম্যাগাজিন গত দুই বছর যাবৎ প্রকাশ করে আসছে যাতে ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা লেখালেখির মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে থাকে এই ম্যাগাজিনে।

লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রাইম ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছাত্রীরা খেলাধুলার দিক থেকে পিছিয়ে নেই। প্রতিনিয়ত তারা বিভিন্ন ধরনের ইনডোর, আউটডোর গেমস এ অংশগ্রহণ করে আসছে বিশেষ করে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সমন্বয়ে গঠিত ''ক্রেমন ইনডোর ইউনি ক্রিকেট'', ''ইন্টার ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট'', ''ইউল্যাব ফেয়ার প্লে কাপ'' ক্রিকেটসহ অন্যান্য খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে আসছে।

প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে রয়েছে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। ছাত্র ছাত্রীরা অতি সহজে লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে লেখাপড়া করতে পারে। ইউনিভার্সিটিতে রয়েছে সুবিশাল রিডিং রুম যেখানে রয়েছে প্রায় ২৯,০০০ বই, ১,০০০ সাময়িকী, ৩০,০০০ ইলেকট্রনিক পুস্তক ও ৩,০০০ সাময়িকী। গ্রন্থাগারে আইটি সুবিধা, লাইব্রেরি ই-রিসোর্স সেন্টারে বসে প্রয়োজনীয় ই-বুক বা জার্নাল ডাউনলোড করার সুবিধা আছে। যেহেতু পুরো ক্যাম্পাস ওয়াই-ফাই সমৃদ্ধ তাই ছাত্র ছাত্রী ইউনিভার্সিটিতে বসেই যে কোন বই ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস অতি সহজে অনলাইন থেকে সংগ্রহ করতে পারে।

প্রাইম ইউনিভার্সিটি ''a home for rendering prime knowledge'' এই স্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে যার অর্থ সর্বোচ্চ এবং সেরা জ্ঞান দানের সেবা কেন্দ্র অর্থাৎ যেখানে সামনের বিশ্বকে জয় ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে সেরা জ্ঞান দানের মাধ্যমে এ বিদ্যাপিঠ মানসম্মত গ্রাজুয়েট তৈরি করে যাচ্ছে। প্রাইম ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েটেরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করছে এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে দেশপ্রেমকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। জ্ঞানদানের এবং গ্রহণের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা এই ইউনিভার্সিটিতে বিদ্যমান সুতরাং এই ইউনিভার্সিটিতো অন্যদের চেয়ে একধাপ হলেও এগিয়ে আছে এবং থাকবে। তাই জ্ঞান আদান প্রদানের শীর্ষ স্থানীয় এই বিদ্যাপিঠকে প্রাইম বা সেরা বিদ্যাপিঠ বললে কোন ক্রমেই বাড়িয়ে বলা হবে না। দেশ গড়ার কাজে প্রাইম ইউনিভার্সিটি প্রাইম জ্ঞান বিতরণ করে চলেছে যা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় জ্ঞানকর্মী সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। এসব বিষয়ের জন্য প্রাইম ইউনিভার্সিটিকে প্রাইম বলা হয় এবং প্রাইম ইউনিভার্সিটির মূলমন্ত্রই হল সব বিষয়ে প্রাইম থাকা।

Women's Share in Property and Wealth and its Impacts on Their Rights and Health in Bangladesh

Dr Yeasmin Jahan
41st Batch, LLM (2th years)
ID: 161050104003

An important observation shows that there is a deep relation of women's health with woman's right. Women's share on property and wealth is also included in women's right. For example, One's dignity, honor and respect depend on how much one enjoys economic freedom in life. Economic freedom helps to build up decision making capacity. It is obvious that woman empowerment begins from the decision making capacity of the woman folk in general.

Our country, Bangladesh is densely populated by Muslims and then by Hindus, Buddhists, Christians and tribal people. In Muslim community, there are various pictures reflected in our society. In the constitution of Bangladesh clause (i) of Article 29 of the constitution guarantees equality of opportunity for all citizens in the matter of employment-women or children or for the advancement of any backward section of citizen - of religion, race, caste, sex, place of birth, ensured by Article 29. So, all citizens are equal irrespective of religion, gender, color and ethnicity according to the Article 29. Women's share is distributed according to the religion and family law.

According to the Islamic law of succession, daughter gets 1/2 of the son. In our society this 1/2 share is not given properly. In most cases, daughters do not get their share of property. Notwithstanding, if they demand, the less valuable portion of the property is given to them. It is most practiced culture that daughter or sister cannot demand their share of their father's property. Demanding paternal share by the sisters is considered a matter of shame in the society. Besides, brothers think that sisters should not take their share because if there is marital disharmony of their sisters, father's or brother's house is their last shelter and due to the fact that, most of the brothers do not give their sisters' share in their paternal property. In this connection, we see many instances that brothers become so violent and even hurt their sisters both physically and mentally. A few years back, it was found in the Newspaper at Gazipur district that one pregnant sister was murdered by a brother because their

father gave the share to his daughter.

In the Holy Quran, no discrimination is found in terms of distributing the parental property among the brothers and sisters, rather it suggests the equal ownership of the children irrespective of sons and daughter. Moreover, the Quran has emphasized much about the rights of women but its modification occurs in practice by the patriarchal society. However, male dominated world preserves the benefits of man in every worldly affair. If somebody passes away leaving only daughters, the sharers come to take their shares. Most of the time, they are not soft and sympathetic. They do not even think of the widowed and fatherless daughters. At present, many earning daughters look after their parents in this altered situation.

In pre Islamic period, woman had no security because women were not able to ride on horse, go to the war, and protect themselves from enemy. So, they had no share in property and wealth. At first, Islam recognized the rights of women to protect their life as female child, daughter, girl, wife, mother and old mother. In pre Islamic period, alive female children used to be buried. Fifteen hundred years have passed but still various types of physical and mental tortures of women are predominantly prevailing in the society. The paternal property is occupied usually by brother. Brother has no interest to give the share of sister. It is a common picture in our country. Just after the birth, female child becomes the victim of several discriminations and even educated and well established father and mother do not feel hesitation to discriminate a highly educated and established daughter. Daughter is considered the second class type of offspring; not so valuable like male child.

On the contrary, male child is the light of the family. In modern days, sons forget their parents' death anniversary date in many cases. But they enjoy all the establishments of their father and mother. Even they do not want to spend money for Doamohfil just after their father's death. This is the return of sons for their loving parent. Many sons in the society unlawfully bias their father and mother to gain good share and more property.

In another context, dignity as well as honor is also a kind of wealth. According to the context of present law, mother is not guardian, rather she is only the custodian of her child. In absence of father, paternal grandmother and paternal uncle will be the guardian until children are

well established and well educated. No doubt, it is the question of dignity, honor and respect. This situation creates so many problems in the life circle of a woman.

Besides, inheritance law of Hindu follows that girls do not get paternal share after their marriage but when they marry off, they are given money and property as the dowry and this dowry culture induces the Muslim community and destroys the share system of Muslim women.

Next to Hindu community, Buddhists in Bangladesh also follow the Hindu Daivagh Theory. Buddhist women have no share in property and wealth as well. However, Chiristan women get share in property and wealth. Their practices are good in Bangladesh. Male and female get equal share. But there are many disputes in distribution of property between brother and sister. If brother wants to deprive sisters, sister can file a suit. The court gives judgment for the sister. Among our tribal people, we see that there are so many variations. In Chakma community, patriarchal system prevails. Their women do not get share of the paternal property. In Marma community, patriarchal society is also present. Marma women do not get any share. But educated and established family give share to their woman. Tripura community mostly lives at Khagrachari and lives in different plane land and belong to Islam and Hindu religion. They are in the patriarchal society. Their share is distributed according to the religion. In Garo community, there we see different picture. They are in the matrinial system. They come from the Meghalaya tribes and can be classified into 3 groups and they are Garo, Khasia and Jainta. After marriage, male person comes to the woman's house and ultimately share transfers from mother to daughter.

Sawtal is known as one of the oldest tribes in Bangladesh. They are converted into Hindu or Christian. Sawtals follow the Sarna religion. They have Gods and Goddesses. In Rajshahi area, they are mostly found. They depend on agriculture. If father has any property, he gives it to his son. If mother has any property, she gives it to her daughter.

No share in property and wealth causes insecurity of life. These cause more maternal morbidity and at the same time, less dignity causes deprivation. Deprivation brings depression. Most of the women in Bangladesh suffer from depression. Depression is the prime cause of illness.

More than 35 years I have been working in government health service. I have experience to work in every step of Health services as a specialist in gynecology and obstetrics. The different steps of health services are community clinic at village level, family welfare center at union level, Upazella health complex, District sadar Hospital, 250 Bed general hospital, Medical college & hospital, BSSMU, Ministry of health and family welfare and Ministry of local government, Rural Development, and Co-operative. I have seen pangs of sufferings of womankind due to lack of decision making capacity and economic freedom. So, proper and dignified distribution of share on the basis of present situation are very essential. Establishment of woman rights irrespective of race, religion and ethnicity is the demand of the time. For this, we need new Qiyas and Ijma, amendment of old law, creation of new act and proactive and open minded law commission. If women get proper and dignified share, they get relief from many illness and sufferings. In 1997, I presented a scientific paper in Copen Hagen, Denmark in a world congress of FIGO (Federation of International Gynecologists and obstetrician). The title of this paper was woman's right and woman's health are the back ground of management of gynecological and obstetrical patient. In 2000, I also presented a paper in Washington DC in FIGO world congress. This paper was a qualitative study titled "Violence against woman observed in sadar Hospital Rajbari." I have seen the darkness in the society. Huge number reports of medicolegal cases I presented in front of the court. The cases were rape victim, illegal abortion, postmortem of murder case after rape. The history shows that no dynasty is safe for the female individual and all females are subject to facing different types of violence since the birth.

Finally, I would like to say, in Bengali to English dictation, there is no word for "Matritantric Somaj Babosta." In google, the opposite word 'patriarchal society' is found while searching 'Matritantric somaj'. At present, we see so many successful women heading towards family, society and the country. But this has had little recognition and this ultimately causes a lot of health hazards of the women in general.

মাদকাসক্তি জাতীয় উন্নয়নে বড় বাঁধা

এ্যাডভোকেট মায়ারানী দেব (ভৌমিক)
৪৭ তম ব্যাচ, এলএলএম
আই.ডি: ১৮১০৫০১০৪০০৩

মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী হল সংস্কৃতি আর জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত উপকরণই সভ্যতা। মানুষ সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য যুগে যুগে সংগ্রাম করেছে। গড়ে তুলেছে নতুন সভ্যতা, সংস্কৃতি। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি মৌলিক চাহিদা পূরণের সংগ্রামে সমাজ যখন ব্যতিব্যস্ত তখনই অগণিত সমস্যার সাথে মাদকাসক্তি একটি "রেডমার্ক"সমস্যা হিসেবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মাদকাসক্তি একটি বিপজ্জনক পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা। আমাদের দেশের তরুণ সমাজ আজ মাদকাসক্তিতে ভীষণভাবে আক্রান্ত। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে অভিভাবক তথা সকল স্তরের মানুষের মধ্যে একটি ভীতি কাজ করে, পথ চলতে কেউ সাহস পায় না। কোন পজেটিভ দিক মানব জীবনে সাড়া না দিলে সকল প্রকার নেশাই জীবনের ক্ষতি করে। কোনো কোনো জিনিসের প্রতি মানুষের প্রবল আকর্ষণ থাকে। অতিরিক্ত চাপান, রাত জেগে খেলা দেখা, টিভি দেখা, সিগারেট খাওয়া, মদ্যপান প্রভৃতি নেশা যুগ যুগ ধরে উন্নয়নশীল দেশসহ উন্নত দেশসমূহে চলে আসছে। মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি বা নেশা একটা খারাপ অভ্যাস। নেশা সমাজের কোন কল্যাণ করে না, মঙ্গল বয়ে আনে না। মানুষ এখন মানুষকে বিশ্বাস করতে চায় না। ভালো মানুষ দেখলেও মানুষ ভয় পায়, ভাবে নেশাগ্রস্থ কিনা? ছিনতাইকারী কিনা? অনেক সময় পরিস্থিতির কারণে শিকার হয় মাদকাসক্তির। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই তরুণ সমাজ দেশের ভবিষ্যত। একে রক্ষা করা আপনার আমার সকলের দায়িত্ব। মাদক ভবিষ্যত প্রজন্মকে মৃত্যুও দিকে ঠেলে দিচ্ছে সমাজে সচেতন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির দায়িত্ব হবে কীভাবে সমাজকে মাদকাসক্তির ছোবল থেকে রক্ষা করা যায়। মাদকে আসক্ত মানুষের তালিকা প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় তৈরী করে এদের নিয়ে সুশীল সমাজকে বসার ব্যবস্থা করে ক্ষতির দিকগুলো বুঝিয়ে প্রথমে মানসিক পরিবর্তন আনা যেতে পারে। ওরা তো আমাদের সমাজেরই মানুষ, আপনজন। বুঝবে না কেন? মাদকাসক্ত হয়ে তো কেউ জন্মায় না। একটা পরিবারের একজনকে যদি বুঝিয়ে শোধরানো যায় তাহলে মাদকাসক্তদের সংখ্যা আস্তে আস্তে কমে যায়। একটি পরিবারের একজন মাদকাসক্ত সদস্য থাকলেই সেই পরিবার ধ্বংসের দিকে ঢলে পড়ে। এক্ষেত্রে কাজ করতে হবে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি এক সময় অসহায় জীবনযাপন করে। তাদের সুস্থ জীবন ফিরিয়ে আনতে আশ্বাস প্রদান করতে হবে এবং ব্যবস্থা করতে হবে কর্ম-সংস্থানের। আজ সবাইকে শামিল হতে হবে নেশা যুদ্ধের বিরুদ্ধে। ক্ষতিকর মাদকদ্রব্যের উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। রক্ষা করতে হবে সমাজ, দেশ, রাষ্ট্রকে। ধর্মেও আছে "মদ হারাম"। যে নেশা সমাজে কল্যাণ করে না, সমাজের অবক্ষয় আনে, শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি করে তা বর্ণনা করে পৌঁছে দিতে হবে সর্বস্তরে। এক্ষেত্রে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মাদকদ্রব্য নির্মূল করতে, মাদকাসক্তদের শোধন করতে সামাজিক উদ্যোগের ভূমিকা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। দেশের জনশক্তির একটা বৃহৎ অংশ মাদকে আসক্ত বলে তারা কোন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। কর্মসংস্থানের মাঝেও যদি এই অংশের জনশক্তিকে মাদকাসক্ত হতে দূরে সরিয়ে এনে এদের কর্মসংস্থানের

ব্যবস্থা করে কাজে লাগানো যায় তাহলে সমাজ উন্নতির শিখরে পৌঁছবে বলে আশা করা অমূলক হবে না। আর সে জন্যই চাই সামাজিক আন্দোলন। আসুন সবাই মিলে চেষ্টা করি। সফল একদিন হবোই।

আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে যদি সমাজের মাদকাসক্তদের কথা ভেবে ছেলেমেয়েদের বিয়ে, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় না করে তা সংক্ষিপ্ত করে এর একাংশ দিয়েও তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে বেকারত্ব দূর করার চেষ্টা করি তাহলে অনেকটা সমাধানের পথ বেরিয়ে আসবে। নষ্ট হবে না আমাদের সমাজ। রক্ষা পাবে আমাদের সভ্যতা, টিকে থাকবে সংস্কৃতি। সমাজের বাস্তব চিত্র অবলোকনে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, ১টি সন্তানও যেন নেশাগ্রস্ত না হয় এবং কোন প্রকারের কুনেশায় আকৃষ্ট না হয়। সন্তান বড় করার দায়িত্বে মা-বাবার বিকল্প নাই। তাই দায়িত্বশীল সুসচেতন হতে হবে। মা-বাবার ভুলের কারণে যেন কোন সন্তান নেশাগ্রস্ত না হয়। মেধাবী ছেলেমেয়েদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আজকাল নেশাগ্রস্ত হয়ে যেভাবে দেশের উন্নয়নমূলক কাজ হতে দূরে সরে আসছে তা ভাবলে সত্যি দুঃখ হয়। শরীর শিউরে ওঠে। আমরা চাই, ঐ মেধাবীদের সুস্থ হয়ে দেশের উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হউক। তাহলেই দেশ আরও সমৃদ্ধ হবে। আমাদের জাতীয় উন্নয়নের যাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। এই শ্লোগান কার্যকর করতে হবে যে, "অসুখ হওয়ার আগেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।"

মাদকাসক্তি সমাজের অস্থিরতা বাড়ায়, নারী নির্যাতন বাড়ায়। ধনসম্পদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এই সামাজিক অবক্ষয় রোধ করতে সহায়ক হউন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ও সচেতন মানুষেরা।

কালো সাদার বৈষম্য

শাহরিয়ার হোসেন ইমু
৪৭তম ব্যাচ, বিএ (অনার্স), ইংরেজি
আই.ডি: ১৮১০১০১০১০১৫

কালোরাও মানুষ, তাদেরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে, সম্মান পাওয়ার অধিকার আছে, যেটা অন্যান্য দেশে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে তা সম্পূর্ণ উল্টো। কালোদের যেন সমাজের নিচু শ্রেণির কীট বলে ধরা হয় এদেশে। একটা ছেলে যখন কালো তখন আমরা তাকে নাইজেরিয়ান, সোমালিয়ান, নিগ্রো বলে বিদ্রুপ করি। এ সব শুনে সে অনেক কষ্ট পায়। পাবেই না বা কেন বলুন? সে তো মানুষ, বলার সময় আমাদের দৃষ্টিভংগি এমন থাকে যেন সে কালো হয়ে জন্মে পাপ করেছে। আজকের বাজারে সুন্দরদের দাম অনেক চওড়া, আর কালোদের দাম অতি নগন্য। এদেশের মানুষের এমন মন-মানসিকতা আমার বোধ্যগম্য নয়। আমাদের দেশে এমন অনেক চাকরী আছে যেখানে প্রথমেই আপনার গায়ের রঙের দিকে তাকানো হয়। এদেশে মিডিয়ায় কাজ করার জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বড় বড় অক্ষরে লিখা থাকে দেখতে সুদর্শন, গায়ের রঙ ফর্সা থাকা বাধ্যতামূলক। এদেশে কালোরা সিনেমার নায়ক হতে পারে না। এ কেমন মানসিকতা আমাদের? কালো একটা ছেলে যখন একটু ফ্যাশন করতে যায় মানুষ এমনভাবে তাকায় যেন তার সম্পত্তি মেরে খেয়ে ফেলেছে। এসব আমাদের যেনো চোখ মেনে নিতে পারে না। তবে হা, এদেশেও কালোর সম্মান হয়, তবে সেটা আপনি সেলিব্রেটি হওয়ার পর বা আপনার অনেক টাকা হলে বা ভাল মানের চাকরি করলে। যাই হোক গ্রামে একটা প্রবাদ আছে, "স্বর্ণের আংটি বাঁকাও ভালা"। সেই কালো ছেলেটার কাছে হয়ত আহামরি খারাপ লাগে না। কিন্তু একটা মেয়ে যখন কালো হয়ে জন্মায় এ যেন এক অভিশাপ। জন্মের পর কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, মেয়ে কেমন হল, মা যেন দ্বিধায় পড়ে যায় কি বলবে। তখন বলে, শ্যামবর্ণের হয়েছে, বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কেন? কালো থাকলে কি এখন বেঠিক আছে? মেয়েটা যখন বড় হয়, বিয়ে হয় না, ভাল পাত্র আসে না, বাবা মার মাথায় যেনো টেনশনের বিরাট সমুদ্র ঘুরপাক খেতে থাকে। যদিও মেয়েটি শিক্ষিত কিন্তু গায়ের রংটাই যেন অগ্রাধিকার বেশি পায়। মেয়েটি সুন্দর হওয়ার চেষ্টায় মেকআপ নেয়। এদেশে সুন্দর হওয়ার অনেক মেকাপ ক্রিম আছে, কিন্তু কালো হওয়ার কিছুই নেই। এদেশের ছেলেরা কালো মেয়ে পছন্দ করে না। বিয়ে করবে কেন? ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি কালো বিড়াল অশুভ লক্ষণ, কালো শোকের প্রতিক, কালো অশুভ। এসব যেন মানুষের গায়ের রঙের সাথে মিশিয়ে ফেলি আমরা। তাই কালো মানুষগুলো কালো কথা শুনার পর কষ্ট পায়, কিন্তু কাউকে বুঝতে দেয় না, মনে মনে বিধাতাকে দোষ দেয়। আমরা কালো বাইক, কালো ওয়ালেট, কালো ঘড়ি, কালো গাড়ি পছন্দ করি। কিন্তু কালো চামড়া আমাদের সহ্য হয় না। জানিনা মানুষের এসব কালো সাদার দৃষ্টিভঙ্গি কখনো পরিবর্তন হবে কিনা। শুধু এটাই বলবো, কালো শুধু মানুষের গায়ের রঙটাই হয়, ভিতরটা হয়তো অনেক সুন্দর। রঙ নয়, মন দেখুন।

আলো বলে, "অন্ধকার তুই বড় কালো"
অন্ধকার বলে, "ভাই তাই তুমি আলো"
............রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঁশরীর আর্তনাদ

মোঃ মিজানুর রহমান
৪১ তম ব্যাচ, বি.এড
আই.ডি নং ঃ ১৬১০১০৩০১০৩১

দুনিয়াতে মানুষ মরণশীল। এ কথা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে মানতে হয়। বাস্তব চোখে যা দেখি, তা তো আর অস্বীকার করা যায় না। একজন কবি ভাই ছিলেন, তিনি আমাকে বলতেন, আচ্ছা বলোতে দেখি, আমরা কারা? আমি বলতাম, আমরা মানুষ। উই আর হিউম্যান। দ্যাট মিন্স মানব জাতির অন্তর্ভূক্ত, মানব সদস্য আর কি! তাই বাবা আদম এবং মা হাওয়া (আ) থেকে এ যাবৎ মহান আল্লাহপাক দুনিয়াতে কতো মানুষ পাঠিয়েছেন। মানব সমাজে এখন কতো জাতি, কতো ধর্ম, কতো বর্ণ, কতো ভাষার সমাহার সত্যিই তুলনাহীন!

আদম এবং হাওয়া আ. সৃষ্টির পর থেকে শুরু করে মানুষ যদি মরণশীল না হতো, তবে বিশাল মানবসমুদ্র সামাল দিতে মানুষকেই হিমসিম খেতে হতো। মহান আল্লাহপাক চাইলে অবশ্য সে সমাধানও আমাদের করে দিতে পারতেন। কিন্তু সে নিয়ম তিনি, এ দুনিয়াতে রাখেন নাই। এ দুনিয়া মানুষের জন্য একটা পরীক্ষা ক্ষেত্র। এখানে মানুষ স্বল্প সময়ের জন্য আসে পরীক্ষা দিতে। এ কথা আমি যখন জানতাম না, তখন আমার কাছে দুনিয়াটাকে বুঝতে খুব কষ্ট হতো। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অমিল খুঁজে পেতাম। দুনিয়াতে সব কিছুই সাজানো গুছানো থাকবে এমনটাই আশা করতাম, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে।

আসলে দুনিয়া তো সাজানো গুছানোই। তবে তা প্রাকৃতিকভাবে। প্রাকৃতিক ভাবটাকে আমাদের বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন, আমাদের হস্তক্ষেপ সমৃদ্ধ কৃত্রিমতার। যুগে যুগে মানুষ মহান আল্লাহর দেয়া মানসিক ও শারীরিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আজকের ডিজিটালাইষ্ট পৃথিবীকে বানিয়ে তুলেছে এক পরিবার ভুক্ত। সে সুবিধাও পাচ্ছেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে। মরণশীল এ মানুষ যত দিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকেন এর নাম হলোঃ হায়াতী জিন্দেগী। ইসলামী চিন্তাধারায় হায়াতী জিন্দেগীর মূল কাজ প্রধানতঃ দু'টি। একঃ আল্লাহর হক আদায় এবং দুইঃ মানুষের হক আদায়। এ দু'টি হক ঠিকমতো আদায় করতে পারলে অনন্তকালের পরকালীন জিন্দেগী শান্তি ও সুখময় হবে বলে আশা করা যায়।

লেখার শুরুর দিকে আমাদের পরিচয় দিয়েছিলাম মানুষ এবং মানব জাতির সদস্য হিসাবে। মানুষ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ হয় কিনা, সে সম্পর্কে আমার জানা নাই। তবে অনেকে এভাবে মিল দিয়ে বিশ্লেষণ করে থাকেন। যথাঃ মান+ হুশ= মানুষ। তারা বুঝাতে চান, যার মান এবং হুশ আছে তিনিই মানুষ। এ মিলটা আমার কাছে খুবই ভালো ও যথোপযুক্ত মনে হয়। আমি যদি কোন কাজ করার আগে মান-সম্মানের দিকে তাকাই এবং হুশ মতো কাজ করি, তবে সন্ধি বিচ্ছেদ হোক বা না হোক অন্তত: "মানুষ" নামটার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

কলেজ লাইফে ইন্টার সেকেণ্ড ইয়ারে ফেইসবুক ও ব্লগহীন যুগে "বাঁশরীর আর্তনাদ" নামে মাত্র চার পৃষ্ঠায় ছাপা একটা কবিতপত্রে কয়েকটা ছোট-বড় কবিতা লিখে তা ছেপে শিক্ষার্থী

ভাই-বোনদের মাঝে বিতরণ করে প্রচার করেছিলাম। তখন আমি মানুষ সম্পর্কে অতো কিছু বুঝতাম না। এখনই যে খুব বুঝি, তাও বলা ঠিক নয়। এ পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষই মহান সৃষ্টিকর্তার দেয়া আলাদা আলাদা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বর্তমান ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। যেদিন উপলব্ধি করলাম, মানুষ নিয়ে গবেষণা একটা জটিল এবং বিশাল ব্যাপার, সেদিন থেকে মানুষ নিয়ে গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা অনেকটাই কমিয়ে দিলাম এবং নিজেকে একজন প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তোলার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। তদুপরি, কি কারণে জানি এখনো আমি মানুষ নিয়েই লেখা-লেখি করে ফেলি এবং করতে বেশি পছন্দ করি।

ঐ সংকলনে একটা কবিতার লাইনগুলো ছিলো এরকম;- "সবার উপরে মানুষ সত্য/ তাহার উপরে নাই-/ তাই যদি হয়/ মানুষ চিনা বড় দায়/ নিজেকে চিনিবে যে/ মানুষ চিনিবে সে,/ সেই হবে বাস্তব সন্ধানী/ পরিচয় তার আপন যোগ্যতায়।" প্রচলিত প্রথম দু' লাইনের সাথে এখন আমার যে মত পার্থক্য হয়েছে তা হলো, মানুষ সত্য বটে তবে মানুষের উপরেও সত্যের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং বর্তমান। অত:পর একজন মানুষকে প্রকৃত সত্য মানুষ হতে গেলে যোগ্যতা লাগে। শুধু হাত-পা, মুখমন্ডল তথা শারীরিক দিক দিয়ে মানুষ হলেই মানুষ মানুষ হয় না। প্রকৃত মানুষ হতে গেলে, তার মন তথা অন্তরকে মানুষ করে গড়ে তুলতে হয়। কথা-বার্তা, কাজ-কর্মে মানবতাকেই ফুঁটিয়ে তুলতে হয়। মুখে বলি এক আর কাজে করি আরেক; এমন হলে তো আর প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। হওয়া যাবে অন্য কিছু। অন্য কিছুর অন্য শব্দের অদ্যাক্ষর অ- কে মানুষ শব্দটির আগে জুড়ে দিলে যা হয় আর কি!

মানুষকে মানুষ ভিন্ন অন্য কিছু থেকে নিজেকে সামাল দিতে হলে, সবার আগে নিজেকেই একজন প্রকৃত মানুষ হতে হবে। দুনিয়ায় চলার পথে বিভিন্ন বাঁধা বিপত্তি আসবেই। এটাই তো পরীক্ষা। বিভিন্ন ধরণের যতো পরীক্ষাই আসুক; মানুষকে তবু প্রকৃত মানুষ হবার পথেই এগিয়ে যেতে হবে। নিজের ভেতরের অমানুষকে পরাজিত করে জয় করতে হবে, মানবতা তথা মনুষ্যত্বকে। তাই লিখেছিলাম- " মানুষ দু'দিকে ধাবিত হয়/ ভালো আর মন্দ ব্যতীত/ অন্য কিছুতে নয়/ সাধুর সাধুত্ব কর্মহীন নয়/ বিবেক সাথে সাথে রয়/ সমাধান খুঁজে বেড়ায়/ মানবিক জীবনের/ চিরন্তন দ্বন্দ্বের।" অর্থাৎ আমরা ভাবি, সাধু বোধ হয় গাছের নিচে বসে শুধু চোখ বুঝে ঝিমুচ্ছেন। কিন্তু এটা তো ভাবিনা, তিনি তো তাঁর চিন্তা ও বিবেক দিয়ে মানবতার উন্নয়নে সমাধান খুঁজছেন।

ঐ সংকলনে আরো একটা লেখা ছিলো; যা পাঠকদের সামনে তুলে না ধরে পারছি না-" মন!/ যার চাক্ষুষ প্রমান না থাকলেও/ অনুবীক্ষণহীন আছে বিশ্বাসে/ পবিত্রতা!/ কি ধরণের পদার্থ জানিনা/ তবুও আছে অনুভবে,/ মন যখন হৃদয়ের ধারক-বাহক/ যেমনি চালাও তেমনি চলে/ তুমি ঠিক তেমনি/ আমার অন্তলোকে/ বার বার ভেসে ওঠো/ হৃদয় অদৃশ্য, তুমিও অদৃশ্য/ মিল হোক এবার হৃদয়ে হৃদয়।" কি কারণে, কেন লিখেছিলাম? কি'বা বুঝাতে চেয়েছিলাম; তখনকার কথা এখন অতো স্পষ্ট মনে নাই। তবে এখন বুঝতে পারছি যে; বাস্তবমুখী মানুষকেও অনেক কিছু না দেখেই বিশ্বাস করতে হয়। এ দুনিয়াতে আমি একদিন ছিলাম না, একদিন থাকবো না। এ বাস্তব ধ্রুবসত্য, একদিন অদৃশ্যেই ছিলো এবং একদিন অদৃশ্যেই চলে যাবে।

কবিতাটির নিচে মন্তব্য আকারে অল্প কয়েকটা লাইন লিখেছিলাম। লিখাটার প্রথম অংশ কোন একটা বই থেকে সংগ্রহ করা। ঐ অংশটুক ইনভাইটেট কমার ভেতরে রেখে, এরপর ওর

সাথে নিজে কিছু লিখে তা মিলিয়ে দিয়েছিলাম। সংগ্রহকৃত অংশ ছিলো এরূপ- "বাঁশরীর ক্রন্দন সংগীত গীত হয়, বাদকের ওষ্ঠ-পুষ্ঠে যুক্ত হয়ে। মওলানা রুমীও তাঁর আপন বিরহ বেদনা প্রকাশের জন্য খুঁজে ফিরেছেন একজন সমব্যথী, কাতর, বিদগ্ধজন। যার আত্মার সাথে তাঁর আপন আত্মা হবে সংযুক্ত। কথা বলে ওঠবে, দু'টির পরিবর্তে একটি মাত্র আত্মা।" এখানে আমি মানুষের সাথে মানুষের আত্মার সুসম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা যে পূর্বের মনিষীরাও উপলব্ধি করেছেন; সে কথা তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। যা থেকে আমরাও কোন ভাবে মুক্ত নই। আমাদের মানুষ নামের বাঁশরী এখনো এ আর্তনাদ করে ঘুরে বেড়ায় আমাদেরই মাঝে।

পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম, ইসলামী মতে দু'টো হকের কথা। এক, মানুষের সাথে মানুষের আত্মার যে সম্পর্ক এটা হলোঃ বান্দার সাথে বান্দার হক। আর দুই, মহান আল্লাহর সাথে মানুষের আত্মার যে সম্পর্ক; এটা হলোঃ আল্লাহর হক। প্রকৃত মানুষ হতে হলে; উভয়টাই ঠিক রাখতে হবে। তবেই আসবে, মানব জীবনে বাস্তব সফলতা। এ সফলতা অর্জনের জন্য চলতে হবে; মহান আল্লাহপাকের নির্দেশ মোতাবেক, নবী সঃ এর পথে। বিশেষ করে আমরা যদি নিজেকে শেষ নবীর উম্মত হিসাবে পরিচয় দিতে চাই। তখন আসতেই হবে; কুরআন এবং হাদীসের আলোকে। মনে রাখতে হবে, দুনিয়ার এ সংক্ষিপ্ত জীবন এর উপরই নির্ভর করছে; অনন্ত কালের আখেরাতী জিন্দেগী।

কুরআন এবং হাদীস এর আলোকে; প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এ মৃত্যুর কারণেই আমরা দুনিয়াতে আমাদের চিরস্থায়ী ভাবতে পারি না। ভাবতে হয়, মানুষ "মরণশীল"। ইংরেজিতে যাকে বলি; দ্যা ম্যান ইজ মরটাল। "মরটাল" শব্দটা যদি মানি; তাহলে প্রত্যেক মানুষকেই একবার ভেবে দেখা উচিত-হোয়াট ইজ হোয়াট? আসলে প্রকৃত সত্যটা কি? নিজের ভেতরে প্রকৃত সত্য আবিস্কারের দায়িত্ব প্রত্যেকের নিজের উপরই বর্তায়। যেহেতু মানুষ হিসাবে আমরা এক শ্রেষ্ঠ জাতি তথা আশরাফুল মাখলুকাত এর অন্তর্ভুক্ত।

"মরটাল" কিন্তু আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে দুনিয়াদারী করার জন্য দু'টো আত্মিক বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে। একটা হলো রূহ আর একটা হলো নফস। উভয়ই আমাদের দেহে আত্মিক থেকে মানসিক এবং মানসিক থেকে দৈহিক আচরণ হয়ে ফুঁটে ওঠে। কাজ করে জ্ঞান, আবেগ এবং মনোপেশীজ ক্ষেত্রসমূহে। রূহকে আল্লাহর স্মরণ তথা ইবাদতের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন করে নফসকে নিয়ন্ত্রণ এ রেখে, মস্তিষ্ক এবং দেহ পরিচালনাই হলোঃ নিজেকে সর্বদা প্রকৃত মানুষ রূপে ধরে রাখার একমাত্র রূহানী উপায়। যে উপায় মানুষকে প্রয়োজনীয় নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জনে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

এবার আমার লেখা একটা রূহানী গজলের কয়েকটা লাইন দিয়ে "বাঁশরীর আর্তনাদ"শেষ করছি। "আল্লাহপাকে আমাদের জীবন দিছেন/ আমরা যেনো তাঁর শুকরিয়া করি/ চলো নফসানিয়াতের পথ ছেড়ে দিয়ে/ রূহানিয়াতের পথ ধরি।/ নফসানিয়াত বানায় পশুর সমান/ রূহানিয়াত বাড়ায় মানুষের মান/ খেয়াল রাখতে হবে প্রতি পদক্ষেপে / শয়তানের ধোকায় যেনো না পড়ি/ নফসানিয়াত থেকে বাঁচতে হলে / আল্লাহর আশ্রয় যেও না ভুলে/ একমাত্র তিনিই বাঁচাতে পারেন/ বাঁকা পথ ছাড়ি চলো সোজাপথ ধরি"।

গল্প

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : অদৃশ্যযাত্রা
আনিসুল হক : অগল্প
শরীফ খান : প্রাণীদের মজার কাণ্ড
Md Abdul Awal : The Tale of Tall Talks
রেজিয়া খানম : ভালো মেয়েটি
Azmain-ar-Rafi Omi : The Trick of Loan
নূর মোহাম্মদ আরিফ : কালো মেঘে একটু রংধনু
সবুজ খান : জীবনের গল্প

অদৃশ্যযাত্রা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

মাঝরাতে বৃষ্টি শুরু হলো। এখন আকাশজুড়ে আশ্বিনের জ্যোস্না থাকার কথা, কাল রাতেও মোটামুটি আস্ত একটা চাঁদ অনেক মাতাল আলো ছড়িয়েছে। কিন্তু আজ সন্ধ্যা থেকেই চাঁদ অদৃশ্যবাসে গেছে। আকাশের মুখ থমথমে, যেন গোস্বা করেছে, জগৎসংসার অথবা নিজের ওপর। মাঝরাত এসেছে এলোমেলো, ভেজা হাওয়ার ঝাপটায়, সময়ের অনেক আগে, এবং ইরফান সাহেবের জানালার বাইরে একটা কোলাহল শুরু করেছে।

কয়েক বছর থেকে ইরফান সাহেব পড়েছেন ঘুমহীনতার কবলে। তার রাতগুলো আর নিজের অধিকারে নেই। অনেক অনেক বছর আগে অনেক রাত তিনি জেগে কাটাতেন। কিন্তু তখন পাশে থাকতেন আকলিমা বেগম। রাতকে তখন তার খুব বন্ধু মনে হতো; রাত ঘন হলেই আকলিমার চোখ ঘন হতো, নিঃশ্বাস ঘন হতো। তখন অন্ধকার ভেঙে ভোরের আয়োজন শুরু হলে ইরফান রেগে যেতেন। আকলিমাকে বলতেন, রাতগুলো এত ছোট কেন? সে রাতগুলো একসময় ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল। আকলিমা বেগমও মিলিয়ে গেলেন। আজ রাতের চাঁদটার মতো তিনি তার জীবন থেকে অদৃশ্য হয়েছেন। যে রাতে তার অদৃশ্যযাত্রা, সে রাতে ইরফান সাহেব ঢাকা থেকে বরিশাল যাচ্ছিলেন স্টিমারে, বরিশালে ছোটবেলার বন্ধু মতিনউদ্দিনের কুলখানিতে হাজির হতে, যদিও আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল তার-সরকারি চাকরিতে প্রথম পোস্টিং ছিল এই বরিশাল, এবং কিছুদিন থেকে স্বপ্নে তিনি বরিশাল দেখেছেন, কীর্তনখোলা দেখেছেন, এবং কীর্তনখোলার পাড়ে দাঁড়িয়ে আকাশকে সাক্ষী রেখে আকলিমা বেগমের হাতে আংটি পরিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন। আকলিমাকে এই স্বপ্নের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, বরিশাল আমাকে ডাকছে, মতিন মরে গিয়ে সেই ডাক শোনার একটা পথ করে দিয়েছে। আমি যাই?

আকলিমা হ্যাঁ-না কিছু বলেননি। স্বামীর মর্জি তিনি চল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবনে খুব ভালো পড়তে শিখেছিলেন। তার ইচ্ছা ছিল 'না' বলার, কিন্তু তিনি ঠিক জানতেন, দিন শেষে এই না মিলিয়ে যাবে হ্যাঁ-এর কাছে। কুলখানিটা কবে, তিনি শুধু সে তথ্য জানতে চেয়েছিলেন।

আকলিমা বেগমকে সঙ্গে নিতে পারলে ইরফান সাহেব খুশি হতেন। কিন্তু সেটি সম্ভব ছিলনা দুই কারণে। প্রথমত, আকলিমার দুই পায়ের হাড়ে ভর করেছিল গেঁটে বাত। দ্বিতীয়ত, তার ডান চোখে ছানির অপারেশন হয়েছিল মাত্র দিন সাতেক আগে। ইরফান সাহেব তার ভাতিজা মিঠুকে ডেকে পাঠালেন আরামবাগের মেস থেকে। বললেন, চাচিকে দেখে রাখিস। বাড়িতে কাজের মেয়ে ছিল, বাবুর্চি ছিল, একটা ড্রাইভারও ছিল। তারপরও একটু বাড়তি সুরক্ষার জন্য মিঠু। মিঠুর স্ত্রী-সন্তান থাকে বিক্রমপুরে, সে থাকে ঢাকার এক মেসে। চাকরি করে বাংলাদেশ বিমানে। সে কোনো ওজর আপত্তি ছাড়াই বিকেলে বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে,

চাচাকে আশ্বস্ত করেছে, এবং হয়তো এ রকম একটি সম্ভাবনা দেখে বেশি মনোযোগী ভাব দেখিয়েছে যে এ তিন-চার দিন চাচির দেখভাল করে রাখলে এবং তার মন পেলে পাকাপাকিভাবেই এ বাড়িতে থাকতে পারবে। হয়তো পরিবার নিয়েও উঠে আসা যাবে একসময়।

জগতে একশ্রেণির মানুষ যদি নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পছন্দ করে, অন্য একশ্রেণির মানুষ পছন্দ করে পরের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে। এদের পরজীবী বলা যায়, পরগাছাও বলা যায়। মিঠু পড়ে এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে।

ইরফান সাহেব স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলে মিঠু তাকে একটা প্রগলভ গুডবাই জানাল। তাতে হঠাৎ কিছুটা অস্বস্তি হলো ইরফান সাহেবের। এত ঘটা করে বিদায় জানানো কেন, যাচ্ছি তা মোটে বরিশাল।

প্রায় সদরঘাটের কাছে এসে তার মনে হলো, মিঠু ছেলেটার জন্য স্ত্রীর হাত ধরে ভালো করে বিদায় নিয়ে আসা হয়নি। মিঠুর ওপর প্রচুর রাগ নিয়েই তিনি স্টিমারে উঠলেন।

২. স্টিমার চলতে শুরু করলে তার সারা মনজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল কিছু হঠাৎ-শূন্যতা। আকলিমা বেগমকে ছেড়ে শেষ তিনি কোথায় গিয়েছিলেন? কেন গিয়েছিলেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ কলকাতা গিয়েছিলেন, কিডনির চিকিৎসার জন্য। সেই সাত বছর আগে। খুবই যুক্তিপূর্ণ যাওয়া। কিন্তু আজ যে যাচ্ছেন, তার পেছনে যুক্তিটা কী? যাওয়ার কারণ আছে অবশ্য-ওই কুলখানি, ইত্যাদি-কিন্তু যুক্তি? অনেকক্ষণ এটি নিয়ে তিনি ভাবলেন। না, কোনো যুক্তি তৈরি হচ্ছে না। মনিউদ্দিন তার একমাত্র সম্প্রতি মারা যাওয়া বন্ধু নয়। এর আগে-মাস চারেক আগেই বস্তুত-সরফরাজ মারা গেছে। তার আগে সতীশ। তার আগে আসলাম। কারও কুলখানিতে তিনি যাননি। সতীশের ক্ষেত্রে শব্দটা অবশ্য শ্রাদ্ধ। আজ কেন যাচ্ছেন? তা ছাড়া বরিশাল কি একা তাকে ডাকে? শম্ভুগঞ্জ কি ডাকে না? কাপ্তাই অথবা পাথরঘাটা?

বড় একটা পাথরের মতো আঘাত করল তাকে শব্দটা। পাথরঘাটা তাকে ডাকে আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, পাথরঘাটার আনারকলি নামের মেয়েটি তাকে ডাকে। তার নৌকা থেকে পড়ে মেয়েটি মারা গেল, নদীতে ডুবে। ডুবে যাওয়ার আগে মেয়েটি বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। একটা হাত তুলে সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু ইরফান সাহেব আনারকলির হাতটা ধরতে পারেননি। তিনি তো নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারতেন। মেয়েটিকে উদ্ধার করতে পারতেন? তা কি তিনি করেননি এজন্য যে উনিশ বছরের এই মেয়েটি ছিল, যাকে বলে, কাজের মেয়ে, রাঁধুনি, এবং তিনি সরকারি অফিসার, নৌকায় যাচ্ছিলেন দুটি সরকারি প্রকল্প পরিদর্শনে? ঠিক আছে, মেয়েটি না হয় পড়ল নদীতে নৌকা থেকে, পড়ে ডুবে মারা গেল। কিন্তু কীভাবে পড়ল? মাথা ঘুরে? অসাবধানে, পা পিছলে? তাও না হয় হলো, কিন্তু এত বড় নৌকা, মাঝি চারজন। তারা কোথায় ছিল? তার এক খানসামা আর এক চৌকিদার। তারাই বা কোথায় ছিল? ঠিক আছে, নৌকাটা পাড়ের কাছেই না হয় বাঁধা ছিল, তারা ছিল পাড়ের ওপর নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, সাহেব আওয়াজ দিলেই দৌড়ে ফিরে আসার মতো দূরত্বে, কিন্তু তারা কি কিছুই দেখল না? শুনল না মেয়েটির চিৎকার?

ইরফান সাহেবই বা কেন জোরে ওদের ডাকলেন না, মেয়েটি যখন তলিয়ে যাচ্ছিল, সে

সময়? তাছাড়া এই নৌকায় এতগুলো পুরুষ লোক মেয়ে বলতে শুধু এইটুকু এই মেয়েটি, আনারকলি। কেন? অনেক বছর পাথরঘাটা তাকে ডাকেনি। এখন কেন ডাকছে?

৩. বরিশালের স্টিমারে একটি কেবিনে যখন ঘুমিয়ে ছিলেন ইরফান সাহেব, মোটামুটি সেই সময় ভাতিজা মিঠু তার চাচির ঘরে ঢোকে তার সঙ্গে এটা-সেটা গল্প করার জন্য। গল্প করলও কিছুক্ষণ, তারপর চাচির ঘুম পেলে সে চলে গেল। কিন্তু যাওয়ার আগে তার চোখ আটকে গেল স্টিল আলমারিটাতে। সে শুনেছে চাচার প্রচুর টাকা। সরকারি চাকরি করে কীভাবে অনেক টাকার মালিক হওয়া যায়, তা মিঠু জানে। বাংলাদেশ বিমানের একজন কর্মচারীও জানে, প্রতিষ্ঠানটি কেন উড়তে পারে না, কাদের জন্য এবং কারা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির বারোটা বাজিয়ে। আলমারিটা অবশ্যই আড়া লক অ্যান্ড কি। সে ভাবল, চাবিটা নিশ্চয় ধারে কাছে আছে। হয়তো চাচির বালিশের নিচে। কিন্তু চাচি বললেন, আলোটা নিভিয়ে দিতে। মিঠু আলো নিভিয়ে দরজা ভেড়িয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। সে রাতে আরেকজন মানুষ স্টিল আলমারি সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েছে, সে হচ্ছে বাবুর্চি হেলাল। একদিন বাজারের টাকা চাইতে এসে সে দেখেছে, আলমারিটা খোলা। ঠিক কী আছে এর ভেতরে, তার নজরে পড়েনি। কিন্তু তার মনে হয়েছে অনেক কিছু।

আজ সন্ধ্যায় সে একবার দেখেছে আলমারির সামনে বিবি সাহেবা দাঁড়িয়ে। মুখে বিরক্তি অথবা বিষন্নতা, বোঝা যাচ্ছিল না। বুড়ো মানুষের মুখ দেখে এসব বোঝা মুশকিল। তাকে দেখে বিবি সাহেবা মৃদু বকা দিয়েছেন। যাও হেলাল মিয়া, ওই দিকে যাও। তিনি বলেছেন।

হেলাল মিয়া কাজ করছে তিন বছর। একদিনের জন্যও সাহেবকে রাতে বাড়ির বাইরে কোথাও থাকতে দেখেনি। সে ড্রাইভার জামানকে বলল কথাটা। জামানের চাকরি চার বছরের। সেও দেখেনি। তারা দু'জনে বসে ভাবল, আজ বিবি সাহেবা ঘর থেকে বেরোননি, নিশ্চয় তার মন খারাপ।

অথবা আলমারি পাহারা দিচ্ছেন-এটি অবশ্য আলাদা আলাদা, কিছুটা আগে-পিছে দূরত্বে দু'জনে ভাবল। আগে ভাবল হেলাল, পিছে জামান। তবে একত্রে তারা একটি সিদ্ধান্ত নিল, আজ ইচ্ছেমতো খাবে তারা। ডিম, মাছ, মুরগি সব। আজ বিবি সাহেবা রান্নাঘরের তদারকি করাটাও ভুলে গেছেন।
বিবি সাহেবার খাস বাঁদী আনুয়ারা। আনুয়ারার কথা উঠতেই একটু বাঁকা হাসল দু'জন, তবে আপন মনে। আনুয়ারার বয়স ত্রিশের নিচে। শরীর লতলতে। রঙ মেটে, তবে চোখ দুটি খুব উজ্জ্বল। তার কথার প্রচুর ঝাল। তাদের ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। তাদের বাঁকা হাসির অবশ্য এটিই একমাত্র কারণ নয়।

আনুয়ারাকে বিকেলে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন বিবি সাহেবা। অথবা আনুয়ারা সে রকমই বলেছে। যেহেতু কথাটা দু'জনের একজনও বিবি সাহেবকে জিজ্ঞেস করেনি। অথবা করার সাহস হয়নি।

আনয়ারাকে কেন বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন বিবি সাহেবা? আনুয়ারা বাবুর্চি হেলালকে বলেছে, কারণ সাহেবের ভাতিজা মিঠু সাহেব। মিঠুই বা কেন এ রকম একটা স্থানান্তরের কারণ হবে?

৪. শেষ রাতে বাথরুমের চাপ লেগেছিল, নাকি পানির পিপাসা পেয়েছিল আকলিমা বেগমের, বলা মুশকিল। এ সম্পর্কে পরিষ্কার করে তিনিই বলতে পারতেন। কিন্তু তিনি বেঁচে নেই। বাথরুমের সামনেই আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন। মাথাটা লেগেছিল দরজায়। বুড়ো মানুষ। মাথায় আঘাত পাওয়াটা খুবই ভয়ানক। ফলে যা হওয়ার তাই হলো।

আকলিমা বেগম নিশ্চয় চিৎকার দিয়েছিলেন, অথবা তার পতনেও একটা বড় শব্দ হওয়ার কথা। অথচ কেউ শুনল না এসব শব্দ। অবাক। একেবারে ঘুম থেকে ওঠার পর, সেই সকাল ৭টায়, মিঠু যখন ডাকতে গেল চাচিকে, সে টের পেল কিছু একটা ঘটেছে। তার চিৎকারে হেলাল দৌড়ে এলো। মিঠু আর মিনিট দশেক দেরি করলে হেলালই প্রথম আকলিমা বেগমকে মেঝেতে আবিষ্কার করত। সে সকালের নাশতা কী হবে জানার জন্য তার শোবার ঘরে যেত। অন্যদিন এই সিদ্ধান্ত জানাত আনুয়ারা।

মিঠুই থানা পুলিশ করল। পুলিশ এসে অবশ্য ওই হঠাৎ পতনের আলামত ছাড়া আর কিছুই পেল না। ঘরের একটা জিনিসও খোয়া যায়নি। কেউ আলমারি খুলে থাকলেও বোঝার উপায় নেই। তাছাড়া বাইরে থেকে কেউ ঢুকেছে, সে রকমও কোনো প্রমাণ নেই। যদি কোনো ফাউল-প্লে হয়ে থাকে, তা হয়েছে ঘরের ভেতর থেকে। কিন্তু মিঠু বা হেলাল, অথবা গ্যারেজের ওপরের ঘরে থাকা জামান-কাউকে সন্দেহের কোনো কারণ কেউ পেল না।
এখন ইরফান সাহেব ফিরলে যদি ঘরের কোনো জিনিস খোয়া গেছে বলে অভিযোগ আসে, তখন ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু ইফরান সাহেব কোথায়?

বরিশালে খোঁজ পড়ল। সেখানে তিনি নেই। বন্ধু মতিনের কুলখানির জন্য তিনি বরিশাল গেছেন, অথচ কোথাও তাঁর খোজ নেই। এমনকি কুলখানির দিনও তিনি অনুপস্থিত। মিঠু তার সন্ধানে এসে অবাক হলো। কোথায় গেলেন চাচা? বরিশালের থানা পুলিশও কোন হদিস করতে পারল না। তার মোবাইল ফোনটা বন্ধ। কী কারণে বন্ধ? পুলিশ ধারণা করতে পারল না। সে ঢাকা ফিরে গেল। ঢাকার থানা পুলিশও একটু বিপাকে পড়ল। না, মৃত্যুর কারণ বা লাশের সদগতির বিষয় নিয়ে নয়; ডাক্তার বলেছে মৃত্যু হয়েছে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে, মাথায় আঘাত লেগে এবং রক্তক্ষরণে, এবং লাশও রাখা হয়েছে বারডেমের হিমাগারে। ছেলেমেয়েদের খবর দিয়েছে মিঠু, তারা এলে কবর হবে। পুলিশ বিপাকে পড়ল এই ভেবে যে, যদি ডাকাতি হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তো খুনের একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়। সেটি হবে কি হবে না, নির্ভর করে ইরফান সাহেবের ফিরে আসার ওপর। কিন্তু তিনি লাপাত্তা। এখন তিনি আসার আগে তো লাশ দাফনের অনুমতি দেওয়া যায় না। কে চায় কবর থেকে এক মাস পর লাশ তুলে পোস্টমর্টেম করা। অন্তত কোনো থানা পুলিশ চায় না।

ইরফান সাহেব অবশ্য পুলিশকে উদ্ধার করলেন চার দিনের মাথায় ফিরে এসে। তিনি সদরঘাট থেকে একটা সিএনজি স্কুটারে চড়ে এসেছেন। কিন্তু ঘরে ঢুকতেই তিনি বুঝলেন, একটা কিছু ঘটেছে। তিনি জোরে চিৎকার করে উঠলেন-আকলিমা! আকু! শূন্য বাড়িতে তার আকুল চিৎকার শুধু প্রতিধ্বনিই চড়াল।

পুলিশ খবর পেয়ে তার বিলাপের মাঝখানেই এসে হাজির হলো। তাকে বলল, ঘর থেকে কিছু চুরি হয়েছে কি-না দেখতে। তিনি অনিচ্ছা নিয়েও দেখলেন। না, কিছু চুরি যায়নি। আপনি নিশ্চিত, স্যার? দারোগা জিজ্ঞেস করল। নিশ্চিত।

পুলিশ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

তাহলে বারডেম থেকে লাশটা বুঝে নেবেন। দাফন-টাফন এসব আপনাদের ব্যাপার। তবে যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হয়-দারোগা ইরফান সাহেবের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল-আমাকে জানাতে দ্বিধা করবেন না, স্যার।

মিঠু তাকে জানাল, স্যারের তিন ছেলেমেয়ে বিদেশ থেকে পরের দিনই পৌঁছাবে। তারপর শেষকৃত্য। যাওয়ার আগে পুলিশ জিজ্ঞেস করল, স্যারের মোবাইল ফোনটা বন্ধ কেন? ফোনটা স্টিমারে খোয়া গেছে। হয়তো চুরি হয়েছে, তিনি জানালেন।

৫. ইরফান সাহেব যে বললেন দারোগাকে, তার কিছু হারায়নি, কথাটি কি ঠিক? যেমন, তার বাড়ির দলিলের কথাটাই ধরা যাক। সেটি কি হাওয়া হয়ে যায়নি? হোক না ফটোকপি, যাকে বলে কালার্ড ফটোকপি, মূল দলিলের প্রায় অবিকল নকল, তাতে কী? একজন তো কেউ নিয়েছে। সে মিঠু হতে পারে, আবার নাও হতে পারে; কিন্তু আলমারি খুলে নিয়েছে তো।

তাহলে ইরফান সাহেব কেন বললেন না কথাটা পুলিশকে? সে কি এ কারণে যে, মিঠু ও তার দুই ভাইয়ের দাবি আছে তার সম্পত্তিতে, অথচ সেই দাবি জানানোর কোনো পথ খোলা নেই তাদের কাছে? ইরফান সাহেবের অনুজ যে বছর মারা যান হৃদরোগে, সতেরো বছর আগে, যখন মিঠুর বয়স ছিল বারো কি তেরো, সে বছর ইরফান সাহেব নিজের নামেই সব সম্পত্তির মালিকানা লিখে নেন, অপোগণ্ড বাচ্চাগুলো অন্যদের হাতে যাতে না ঠকে সেজন্য।

প্রশ্ন আরও আছে। শুধু দলিল-অথবা দলিলের ফটোকপি-না, ত্রিশ ভরি সোনাও কি খোয়া যায়নি? কে নিতে পারে এই সোনা? এমন কেউ, যে ইরফান সাহেবের পড়ার ঘরের ড্রয়ারে থাকা একজোড়া ডুপ্লিকেট চাবি চুরি করে নিতে পারে, আকলিমা বেগমের বালিশের নিচ থেকে যদি তা নাও নেওয়া যায়। আনুয়ারা যে বিকেলে হঠাৎ বাড়ি চলে গেল অথবা তাকে পাঠিয়ে দিলেন আকলিমা বেগম, তার আগে যে কোনো সময় তো সে ওই ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে আলমারি খুলে গহনা নিয়ে উধাও হতে পারে, আকলিমা বেগম আলমারির চাবি নিয়ে গোসল করতে বাথরুমে ঢুকলেও। বস্তুত ওই মাহেন্দ্র সময়েই। কিন্তু সাহেবের ড্রয়ার থেকে আনুয়ারা কী করে চাবি আনে? সাহেবের ঘরে তো সে একবার-দুবার কিছুক্ষণের জন্য মাত্র ঢোকে। চা নিয়ে, নয়তো কোনো সংবাদ দিতে।

তাহলে কেন ইরফান সাহেব জানাননি কথাটা পুলিশকে? সে কি এজন্য যে তাহলে পুলিশকে এও বলতে হয়, এক রাতে লোডশেডিংয়ের শুরুতে মোমবাতি হাতে তার পড়ার ঘরে ঢুকেছিল আনুয়ারা, এবং এক সময় তিনি জানতে চেয়েছিলেন, বিবি সাহেবা কি অনেক আগে শুয়ে পড়ছেন আজ এবং আনুয়ারা বলেছিল, হ্যাঁ, তিনি বাতের ব্যথার জন্য ঘুমের ওষুধ খেয়ে সাড়ে ৯টাতেই বিছানায় গেছেন, এবং আরও পরে, আনুয়ারার কথার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ড্রয়ারটিতে তার দরকারি কাগজপত্র থাকে, কলম-চাবি এসব থাকে? তার কি সংকোচ হচ্ছিল লোডশেডিংয়ের অন্ধকার নিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে? প্রশ্নের এখানেই শেষ নয়। দলিল আর গহনার সঙ্গে লাখ তিনেক নগদ টাকাও তো গেল। এই টাকা কে নিতে পারে? মিঠু, হেলাল অথবা জামান? হেলালের চাচাতো ভাই নসু, যাকে আকলিমা আদর করে

ডাকতেন দস্যি ছেলে, সে একবার বিদেশ যাবে বলে জমিজমা বেচে, ধারদেনা করে লাখ দুয়েক টাকা জোগাড় করে ঢাকা এসেছিল। টাকাটা একটা খামে ভরে রাখতে দিয়েছিল ইরফান সাহেবকে। ইরফান সাহেব বাইরের বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছিলেন। ছেলেটা মহাব্যস্ত ছিল। পাসপোর্ট নিয়ে দৌড়াতে হবে থ্রি স্টা রিক্রুটিং এজেন্সিতে। সে টাকাটা ওই টেবিলে রেখেই, 'স্যার এটা তুলে রাখবেন, কাল সকালে লাগবে' বলে চলে গিয়েছিল। হেলাল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছিল স্যার মুখ ঢেকে কাগজ পড়ছেন। এটি ইরফান সাহেবের সব সময়ের অভ্যাস। সে 'স্যার নসুর টাকাটা টেবিলে আছে' বলে বার দুয়েক তার মনোযোগ আকর্ষণ করছিল। ইরফান সাহেব 'ঠিক আছে' বলে তাকে যেতে বলেছেন, কাগজ থেকে মুখ না সরিয়েই। তারপর তার এককালের পিয়ন মমিন মিয়া এসেছে, পাড়ার নকিব কন্ট্রাক্টর এসেছে সেই পুরনো এক ঘেঁয়ে গান নিয়ে, 'স্যার দিন না বাড়িটা, ডেভেলপারকে' এবং তিনি 'তা হয় না নকিব মিয়া, এখন যান' বলে তাকে বিদায় করেছিলেন। তারপর মিনিট দশেকেও হয়নি নসুর টাকাটা রেখে যাওয়ার পর, ইরফান সাহেব প্রচণ্ড হুংকারে ডেকেছেন হেলালকে। হেলাল এলে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, টাকাটা কই? তুই নিয়েছিস? বিবি সাহেবাকে দিয়েছিস?

না, নসুর টাকাটা পাওয়া যায়নি। পিয়ন মমিনকে পুলিশ ধরে পিটিয়েছে। টাকাটা উদ্ধার হয়নি। নকিব কন্ট্রাক্টর মাথার কিরা কেটে বলেছে, টাকাটা সে নেয়নি। দেখেওনি টাকাটা কোথায় ছিল। টাকা হারিয়ে বিদেশ যেতে না পারার শোকে নসু ছেলেটা উন্মাদ হয়ে গেল। এখন বাড়িতে আছে। কিন্তু জীবনের হাসি-আনন্দ নেই। হেলাল নিশ্চয় ইরফান সাহেবকে টাকা হারানোর জন্য দায়ী করে এখনও, এবং তার চাচাতো ভাইয়ের মাথাটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য তাকেই দোষে। পুলিশকে যদি তার সন্দেহের কথা তিনি জানান, হেলাল, জামান বা মিঠুকে টাকা নিয়ে সন্দেহের, তাহলে নসু ছেলেটার মাথা বিগড়ে যাওয়ার গল্পটাও চলে আসতে পারে। এ গল্পটা অমানবিক, কষ্টকর। এটি কেউ জানুক, ইরফান সাহেব তা চান না। কে নিয়েছিল নসুর টাকা? তার থেকেও বড় কথা, কে নিয়েছে ইরফান সাহেবের টাকা? গহনা যে নিয়েছে, সেও তো নিতে পারে, অথবা দলিল যে নিয়েছে, সে। তাহলে? কিন্তু তার থেকেও বড় প্রশ্ন, কেন?

৬. স্ত্রী মারা যাওয়ার পর কিছুদিন খুব অস্থিরতায় ভুগেছেন ইরফান সাহেব। সে সময়েই তার ঘুমের সুন্দর রুটিনটা তছনছ হয়ে যায়। রাতে কিছুতেই একটানা ঘুম হয় না। আগে ১১টার মধ্যে শুয়ে পড়তেন, উঠতেন ৬ টার দিকে। আকলিমা বেগম অবশ্য শেষরাতে উঠতেন। তাকে বাথরুমে যেতে হতো। ইরফান সাহেব কখনও কখনও টের পেতেন। কিন্তু ঘুম ভাঙলেও দ্রুত জোড়া লেগে যেত। তাকে ডাক্তার বলেছিলেন, ভালো ঘুম এবং মধুমেহ থেকে মুক্ত থাকাটা তাকে দীর্ঘজীবি করবে।

বাড়িতে মানুষও অনেক কম এখন। দুই ছেলে ও এক মেয়ে আছে তাদের প্রবাস জীবনে। মেয়েটি বাবাকে নিতে চেয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়, কিন্তু স্বামীর নিরাসক্ত ভাব দেখে আর দু'বার বলেনি। ইরফান সাহেব নিজেও প্রবাসে যেতে উৎসাহী নন। দুই ছেলে অবশ্য তাকে রাজি করিয়ে বাড়িটা এক ডেভেলপারের হাতে তুলে দিয়েছিল। একটি আটতলা দালান উঠেছে পুরনো বাড়ির জায়গায়। এজন্য তাকে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতে হয়েছে দেড় বছর। তিনি রাজি হয়েছিলেন প্রধানত আকলিমার কারণে। তার শোবার ঘরের মেঝেতে পড়েই তিনি মারা গিয়েছিলেন। ইরফান সাহেবের জন্য ওই ঘরে ঘুমানো দূরে থাক, ঢোকাটাও ছিল

কষ্টকর। কিন্তু ভাড়া বাসায় থাকতে গিয়ে তিনি খুব কষ্টে পড়লেন। নতুন ঘর, নতুন বিছানা, একেবারে নতুন পরিবেশ। তার ঘুমহীনতা প্রবল হলো।

আকলিমা বেগম মারা যাওয়ার পর হেলাল ও জামান চলে গিয়েছিল, মিঠুও তার মেসে ফিরে গিয়েছিল। অবশ্য ডেভেলপার বাড়ি তৈরি করা শুরু করলে বড় ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে মিঠু কীভাবে যেন একটা ফ্ল্যাট বাগিয়ে নিল। ছোট ছেলে দেশে এসে বাবার কাছে তার রাগ ও বিরক্তি জানালেও ইরফান সাহেব কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি। বিষয়টা ছেলেকে অবাক করলেও শেষ পর্যন্ত সে বুঝেছিল। ছেলেটা বিদেশে ওকালতি করছে, না বোঝার কথা নয়। এখন মিঠু স্ত্রী-সন্তান নিয়ে একটা ফ্ল্যাটে থাকে, কিন্তু একবারের জন্যও চাচার ছায়া মাড়ায় না। ইরফান সাহেব খুব ভালো একটা ফ্ল্যাট পেয়েছেন, ছেলেমেয়েরাও একটা-দুটো করে পেয়েছে, সেগুলো ভাড়া দিয়েছে। সবাই খুশি। শুধু ইরফান সাহেবের ঘুমটা আর ফেরে না।

ভাড়া বাসায় যত দিন ছিলেন, একটা বুড়ো বাবুর্চি ছিল, একটা ছোকরাও ছিল তার দেখাশোনার জন্য। আনুয়ারা একবার তাকে দেখে গিয়েছিল, এবং বলেছিল, গ্রামের বাড়িতে থাকে, দেড় ঘন্টার পথ, বাসে আসতে হয়। তা না হলে ঘনঘনই আসত। যাওয়ার আগে ইরফান সাহেবকে বলেছিল, আবার আসবে। কিন্তু সে আর আসেনি। নিজের ফ্ল্যাটে যখন উঠলেন, বাবুর্চিটাকে রেখে দিলেন, ছেলেটাকে বিদায় করে দিলেন, এবং কাজের জন্য একটা মেয়েও রাখলেন। মেয়েটা সারাদিন থাকে, সন্ধ্যায় বাড়ি যায়। বাবুর্চিই তাকে জোগাড় করে দিল। একটা ড্রাইভারও রাখলেন, তার নাম অনীল। অনীলকে তার খুব পছন্দ। কথা কম বলে, যত্ন নিয়ে গাড়ি চালায়, যা বলেন তাই শোনে।

তবে সবচেয়ে বেশি যা ইরফান সাহেবের পছন্দ, আর দশটা ড্রাইভারের মতো অনীল বাড়ির কথা বাইরে রটায় না। কয়েক রাত তিনি ঘুমহীনতার সামান্য অবসরে স্বপ্ন দেখলেনঃ আকলিমা বেগম তাকে বলছেন, বিয়ের গহনাগুলোও হারিয়ে গেল? স্বপ্নটা প্রতি রাতে একটা আঁচড় পড়া ডিভিডির মতো একই জায়গায় পুনারাবৃত্ত হতে থাকল। ভোরে বিছানা ছাড়ার আগেও ইরফান সাহেব পরিষ্কার পুরো স্বপ্নটা আবার মনে করতে পারলেন। তার অবাক হওয়ার কথা, নিজের মৃত্যুর শোক ছাপিয়ে আকলিমার কাছে বড় হয়ে উঠল গহনা হারানোর শোক। কিন্তু তিনি অবাক হলেন না। তিনি বরং অনীলকে ডেকে বললেন, অনীল, চলো, একটু নরসিংদীর দিকে যাই। তিনি গেলেন, এবং দুপুরে যখন ফিরলেন, তার হাতের পোঁটলায় আকলিমার বিয়ের গহনা।

দু'দিন পর কাগজে নরসিংদীর একটি গ্রামে বিষ খেয়ে এক গৃহবধূর আত্মহত্যার কথা উঠল। সে উঠতেই পারে। প্রতিদিন এ রকম অসংখ্য গৃহবধূ মৃত্যুকে ডেকে নিচ্ছে পরিত্রাণ হিসেবে। এক্ষেত্রে অবশ্য ঠিক কী কারণে আত্মহত্যা, তা পরিষ্কার বলা হলো না। স্বামী জানাল, সে মাঠে কাজ করছিল, দুপুরে খাবার খেতে এসে দেখল বউ পড়ে আছে রান্নাঘরের মেঝেতে। মুখে ফেনা। জিনিসপত্র কিছুটা ওলটপালট। মুড়ি রাখার টিন থেকে সে একটা কিছু বের করেছিল, তা বোঝা যাচ্ছিল।

স্বামী জানাল, বউয়ের গলায় লাল দাগ ছিল।
আর কেউ কি ছিল না বাড়িতে?
না। ছেলে স্কুলে গিয়েছিল।

প্রতিবেশীরা কেউ বোঝেনি, একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছে?
না। দুই প্রতিবেশীর ঘর বেড়ার ওই পারে। বেড়াটা নতুন লাগানো। দুই বছর থেকে তার ঘরবাড়ি বদলেছে, নতুন চাল উঠেছে, বেড়া বসেছে চারদিকে। একটা ঘর নতুন তুলেছে। গোয়াল হয়েছে, গরুও কিনেছে। স্ত্রীর চাকরি করা টাকায়।
স্ত্রী চাকরি করত?
হ্যাঁ, ঢাকায়, এক বাড়িতে। বছর তিনেক হলো জমানো টাকা নিয়ে ফিরেছে।
পুলিশে কেন কেস হলো না?
কী বলেন!
ইত্যাদি।

৭. ফেরার পথে অনীল অনেক বিস্ময় নিয়ে ভেবেছে, স্যারের হাত এতটা কাঁপছিল কেন, যখন গ্রামের রাস্তা মাড়িয়ে, পায়ের ধুলো উড়িয়ে বড় রাস্তার পাশে রাখা তার গাড়িতে তিনি উঠে বসেন? গা কাঁপছিল কেন? চোখটাই বা এ রকম লাল ছিল কেন? হাতে শক্ত করে ধরা একটি পোঁটলা ছিল। কে দিয়েছিল তাকে পোঁটলাটা? অথবা, মাইল দশেক আসার পর একটা পুলে উঠলে তিনি একটি কিছু গাড়ির জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন কেন? বস্তুটাই বা কী? কাঁচের শিশির মতো কিছু মনে হয়েছিল অনীলের কাছে। আবার নাও হতে পারে। কে জানে! অনীলের স্বভাব চুপ করে যাওয়া, কথা না বলা। সে চুপ করে গেল।

৮. আজ মাঝরাতে বৃষ্টি শুরু হলে ইরফান সাহেব অবাক হলেন। কোত্থেকে এলো এই বৃষ্টি? তিনি জানালাটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখলেন, বেশ জোরেশোরে বাতাসও দিচ্ছে। ছয়তলায় তার ফ্ল্যাটটাতে ঘনঘন ঝাপটা লাগছে বৃষ্টির। তিনি শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনলেন। এক সময় চোখের পাতা ভার হয়ে হয়তো একটু ঘুম এলো, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি জেগে উঠলেন। প্রবলভাবে জেগে উঠলেন। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে থাকল তার, স্বপ্নের আঘাত পাওয়া কোনো মানুষের মতো। না, আকলিমা বেগম নয়। আজ তার স্বপ্নে হানা দিয়েছে নরসিংদীর ওই গৃহবধূটি। নামটা কী জানি ওই গৃহবধূর?

নামের কী প্রয়োজন? কাগজের রিপোর্টার যদি ভুল নাম দিয়ে একটা খবরই ছাপিয়ে দিতে পারে, তাহলে আমাদেরও তার নাম জানাটা কেন জরুরি বলুন? আমাদের জন্য বরং যা জরুরি, তা হলো, এ মুহূর্তে ইরফান সাহেবকে দেখা। তিনি স্বপ্নে মেয়েটির ডাক শুনে উঠে বসেছেন, তারপর বিছানার পাশের ছোট টেবিলের ড্রয়ারে অস্থির হাতে কিছু খুঁজছেন। এই ড্রয়ারে তিনি ওষুধ রাখেন। ওষুধের ভিড়ে কাঁচের একটা শিশিও আছে, যে রকম একটা শিশিকে অনীল একঝলক গাড়ীর জানালা দিয়ে উড়ে নদীতে পড়তে দেখেছিল। অনীল অবশ্য নিশ্চিত ছিল না, ওটি শিশি কি-না। আমরাও না। তিনি কি শিশিটা পেলেন? না পেলে কি টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালাতেন না?

অগল্প

আনিসুল হক

প্রিয় মাহবুব আজীজ,

আপনি আমার কাছে গল্প চেয়েছেন। আপনি জানেন, আপনি কিছু চাইলে আমি 'না' করতে পারি না। আপনার সঙ্গে আমার আত্মীয়তা তো আজকের নয়, বহুদিনের, বহুকালেরও। সবাই তো আর সব কথা জানবে না। রংপুর টিচার্স ট্রেনিং কলেজকে আমরা বলতাম জুনিয়র ট্রেনিং কলেজ। তা বিখ্যাত ছিল লিচুগাছের জন্য। তার মাঠে অনেকগুলো লিচুগাছ ছিল। আমরা স্কুল যাওয়া আর ফিরে আসার জন্য ওই কলেজের মাঠটার ভেতর দিয়ে পায়ে চলা পথটা বেছে নিতাম, পথ-সংক্ষেপ করতে। কলেজের মাঠ পেরিয়ে শুরু হতো শটিবন, তাতে বেগুনি রঙের ফুল ফুটে থাকত, সাদা রঙের মধুফুলের গাছে প্রজাপতি লাফাত, চোরকাটার ওপরে ঝাঁক বেঁধে উড়ত ফড়িং, চোতরা বনে উঁকি দিত বেজি, একটা ছোট্ট খাল, তাতে জল আছে কি নেই, সেটা পাড়ি দিতে পারলেই আমাদের পিটিআই ক্যাম্পাস, যার ভেতরে আমাদের কোয়ার্টার ছিল। আপনার আব্বা ছিলেন বিএড কলেজে, আমার আব্বা পিটিআইতে। সেসব কথা তো আর কেউ জানবে না। কিন্তু আপনি চাইলে আমি যে না করতে পারি না, তার কারণ আপনি নিজে কবি, এবং নিজে লেখক। কবিকে কখনও ফিরিয়ে দিতে নেই।

এখন গল্প লিখি কী করে? গল্প লেখার জন্য যা দরকার হয়, তার নাম স্থিরতা। বুদ্ধদেব বসুর একটা কবিতা আছে, শিরোনাম 'সৃষ্টির মুহূর্ত'-তাতে তিনি বলছেন, 'তার নাম অবসর, তুমি যার স্নিগ্ধ সমীরণ।' অবসর ছাড়া সৃষ্টি হয় না। দুধ যখন দই হয়, তখন দুধকে জমতে দিতে হয়। থিতু হওয়ার সময় দিতে হয়। আজকাল অবশ্য দই বানানোরও মেশিন বেরিয়েছে। তবে গল্প লেখার মেশিন তো এখনও বের হয়নি। তবে হবে। আজকে আমি গল্প দেব না। ভীষণ ব্যস্ততা যাচ্ছে। অস্থিরতার ভেতর আছি। আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী। সুদূরের পিয়াসী আমি নই, তবে সুদূরের যাত্রী। কাল আমার ফ্লাইট। যাব বহু দূরের দেশে। অথচ সুটকেস গোছানো হয়নি। হাতের কাজ শেষ করিনি। অফিসে অনেক কাজ। গল্প লিখি কী করে?

গল্প লেখা কঠিন। কারণ বানিয়ে লিখতে হয়। এক বা একাধিক চরিত্রকে একটা সময়কালের মধ্যে রাখতে হয়। একটুখানি বিশদ বর্ণনা না করলে চরিত্রটা দাঁড়ায় না, ছবিটা দেখা দেখা যায় না। আমার পক্ষে গল্প লেখার চেয়ে সত্য ঘটনা বলে ফেলা সোজা। তাহলে একটা সত্য ঘটনা বলি। একবার আমি বাসে করে রংপুর যাচ্ছিলাম। আমার পাশে বসেছিলেন একজন দাড়িওয়ালা মানুষ। বয়স ৫৫ কি ৬০। বেশ ক'বছর আগের ঘটনা। দশ কি পনেরো বছর আগের। তারও বেশি আগেরও হতে পারে। বিশ বছর হয়তো...। গাবতলী থেকে বাসে উঠেছিলাম, শুধু এই কথাটা মনে আছে।

আচ্ছা, মাহবুব আজীজ, আপনি তো নিজে লেখেন, সম্পাদনা করেন, আপনি বলেন তো পনেরো বছর আগের ঘটনা যখন কোনো লেখক বর্ণনা করে, তখন তারা এত ডিটেইল দেয় কীভাবে। ধরা যাক, এই রকম পরিস্থিতিতে বলা হয়- সেদিনের সকালটা ছিল বিষন্ন। সকাল থেকেই আকাশটা ছিল মুখ-গোমড়া। বৃষ্টি হচ্ছিল ঝিরিঝিরি। একটা স্কুটারে করে আমি গিয়ে পৌঁছালাম গাবতলী, স্কুটারওয়ালা নীল রঙের পলিথিনে যাত্রীর শরীর বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। আমার কাছে ভাংতি ছিল না, আমি ১০০ টাকার একটা নোট দিয়ে বাকি টাকা না নিয়েই বাসে গিয়ে উঠে পড়েছিলাম, আর স্কুটার থেকে বাস, এই পথটুকুন পেরোতে গিয়েই আমার শার্ট মাথা পুরোই ভিজে গিয়েছিল। বাস তখন ছাড়ি ছাড়ি করছে। স্টার্ট দেয়া হয়েছে, ড্রাইভার সিটে বসে আছেন আর পুরো বাস যাত্রী-বোঝাই। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, আমি ছাড়া বাকি যাত্রীরা এই বৃষ্টির ভেতরে ঠিক সময়ে বাস টার্মিনালে আসতে পারল কী করে? সমস্য কি তাহলে কেবল আমারই? মাহবুব আজীজ, আমি কিন্তু এই গল্প করছি বানিয়ে, পনেরো কি বিশ বছর আগে একদিন সকালবেলা রংপুরগামী বাসে কীভাবে উঠেছিলাম, এটা আমার মনে থাকার কথা নয়। আর আমি তখন কি এসি বাসে চলাচল করতাম নাকি নন এসি বাসে? রংপুরে এসি বাস কখন থেকে শুরু হলো? আমার মনে আছে, যখন ঢাকা-চট্টগ্রাম প্রথম এসি বাস চালু হলো, তখন ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে লাগত পাঁচ ঘন্টা, সর্বোচ্চ ছয় ঘন্টা। তখন প্রথম যিনি এসি বাসে চট্টগ্রাম যাতায়াত করেছিলেন, তার কাছে আমি তার অভিজ্ঞতা জানতে চেয়েছিলাম, তিনি বলেছিলেন, আরে এসি বাসে গেলে আপনার শরীর টায়ার্ড হবে না, মনেই হবে না যে আপনি জার্নি করেছেন। আর রংপুরে যখন এসি বাস চালু হলো, তখন যাত্রীরা প্রতিবাদ করেছিল, আমরা এসি বাস দিয়ে কী করব, এমনিতেই ঠাণ্ডায় বাঁচি না। আর সেই বাসের টিকিট কেনার সাধ্য কম লোকেরই ছিল। আর আজকে ঢাকা থেকে সৈয়দপুর রোজ তিনটা ফ্লাইট যাতায়াত করে, টিকিট পাওয়া যায় না।

যাই হোক, আমার পাশে একজন দাড়িওয়ালা সরলসোজা মুরুব্বি গোছের লোক বসেছিলেন। তাকে আমি জিগ্যেস করলাম, আপনি রংপুরে কোথায় থাকেন? তিনি বললেন, হামরা বাহে রৌমারী থাকি। রৌমারী? বাহ। আপনি জানেন-রৌমারী একাত্তর সালে স্বাধীন ছিল। ব্রহ্মপুত্রের ওইপাড়ে হওয়ায় ওটা কখনও পাকিস্তানিরা দখল করতে পারে নাই। জানি বাহে, জানমো না ক্যানে? আপনি তখন কী করতেন? ছিলেন রৌমারীতে? না বাহে। তাইলে কই ছিলেন? হারা আছিলাম এই পারত। গেরিলা অপারেশন করবার নাগছিলাম।
গেরিলা অপারেশন?
হয় বাহে। হামরা ট্রেনিং নিয়া নদীর ওইপারত যায়া যুদ্ধ করবার লাগছিলাম।
কী বলেন! আপনি মুক্তিযোদ্ধা?
হয় বাহে।
কী হয়?
উয়াকে হয়।
মানে কী? আপনি মুক্তিযোদ্ধা?
হয় বাহে। আমরা ট্রেনিং নিয়া ওই পারত যায়া যুদ্ধ করিতাম। মুই রাইফেল চালাবার শিখছুনো বাহে।
রাইফেল চালাতেন?
হয়। থ্রি নট থ্রি।
তারপর...

তারপর ধরেন হাইডআউট কয়। তাকে করা লাগত। মাহবুব ভাই আছিল আমার কমান্ডার। হামরা ভাতা পাইতাম। যুদ্ধ করতাম। আবার এই পারত আসিয়া হামরা বর্ডারের এই পারত যায়া শিখ মেজর আছিল। তাকে রিপোর্ট করিতাম।
তারপর?
তারপর তো যুদ্ধ শ্যাষ হয়া গেল। জয় বাংলা হয়া গেল।
তারপর?
তারপর তো যুদ্ধ শ্যাষ হয়া গেল। জয় বাংলা হয়া গেল।
তারপর?
তারপর হামরা আবার গেরামত যায়া ক্ষেতি কাম করি।
মানে কী?
চাষবাস করেন?
হয় বাহে। ধরেন কয়েক বিঘা জমি আছিল তো বাপের। সেইটা আবাদ করি খাইতাম।
তারপর?
তারপর তো নদী ভাঙি খাইল। জমিজমা আর নাই তো। তাই এলা আদি করি। মানষের জমি আদি করি।
আর?
আর লাগলে কিষাণ খাটি।
আপনি মুক্তিযোদ্ধা? আপনার সার্টিফিকেট আছে? কী কন না বাহে। মুই কি লেখাপড়া জানো, যে মোর সার্টিফিকেট থাকিবে?
না না। লেখাপড়ার কথা হচ্ছে না। আপনি মুক্তিযোদ্ধা, আপনার সার্টিফিকেট লাগবে না?
না। ক্যানে। মুই কি চাকরি করিম?
তা না করেন। একটা সার্টিফিকেট থাকবে না?
ক্যানে? মুই ক্যানে চাকরি করিম? মুই মুক্তিযোদ্ধা। মুই তো স্বাধীন। মুই হাল চাষ করি খাই। নিজের গা খাটি খাই। মোর ক্যানে সার্টিফিকেট লাগিবে?
আপনি সরকারি সাহায্য কিছু নিয়েছেন?
না বাহে। আমার না লাগিবে।
কী বলেন! লাগবে না?
ক্যান বাহে মুই কি সাহায্যের বাদে যুদ্ধ গেছিলাম? হামার দ্যাশের লাগি যুদ্ধে গেছিলাম।
বলেন কী? আপনার সাহায্য লাগবে না?
দূরে বাহে। সাহায্য নিলে মানসম্মান থাকে? হামার সম্মান আছে। মুই কারো কাছত হাত না পাতোম।
আরে আপনি না চাইতে পারেন, আমাদের কর্তব্য তো আপনাদের সম্মান করা।
সেই সম্মান ধরেন নিজের কাছে। হামরা পাই কেমনে?
শোনেন। মুই তো তখন ছোট। ষোল কি আঠারো বছর বয়স। মুই তো আছিলাম একজন আখাল। গরুর আখাল। হামার নিজের গরু। সেগলা চরাই। হামার সাথত আছিল একজন মাস্টার। তাঁয় কিন্তু আর স্বাধীন দ্যাশত ফিরবার পারে নাই। হামরা যে বগামারিত যুদ্ধে গেছিলাম ওই অপারেশনের সুমে উয়াকে গুলি লাগে তো। তাকে হামরা কান্দে করি আনবার পারি নাই। পলায়া আসছি। যদিল আনবার পারিলাম হয়, তাঁই বাঁচপারও পারিল হয়। ব্লাড দিলে ধরেন বাঁচি যাইত। পলায়া আসছি। আনবার পারি নাই। সেগলা মনে হইলে মনে কয়, বাঁচি আছি, খাই, কাম করি, মেহনত করি, আল্লায় ভাল থুঁইছে। ভাল আছি। তো ধরেন শামসু মাস্টার মরি গেল। অক্ত পড়ি পড়ি মরি গেল। তাঁয় মাস্টার। আর মুই গরুর আখাল।

কী হইছে। এগলা কী কন। ক্যানে সরকারের সাহায্য নেমো। মোর এগলা না লাগে।
আপনার ছেলেমেয়ে জানে! আপনি মুক্তিযোদ্ধা। জানে তো। জানবে না ক্যানে? গপসপ করি তো। কিন্তুক হামার যুদ্ধ হামরা করছি, ওমার যুদ্ধ ওমরা করবে। স্কুলত যায়। লেখাপড়া শিখতেছে। হামরা যারা বাঁচি আছি, তারা তো আছিই। যারা ধরেন শহীদ হইছে, তারা তো আর আসিয়া কিছু দাবি করিবার না পারিবে। তাই মুই কও কি মোর কিছু না লাগিবে। বাহে দুই দিনের দুনিয়া। কী এত লাগে বাহে।

তারপর বৃষ্টি আরও বাড়ল। আমাদের বাস ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। ভয় লাগছে। সামনে কিছু দেখা যায় না। আবার না অ্যাকসিডেন্ট করে।
আমার পাশের মুরুব্বি ঘুমিয়ে পড়েন, আবার জাগেন। আমার ঘুম আসে না।
মাহবুব আজীজ, এই ঘটনা অনেক দিন আগের। এই গল্পটা আমি ঠিকমতো বানাতে পারছি না, কারণ আমি সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মেশাতে চাইছি না।
কিন্তু বাস তো চলবেই। আর আমি এক সময় রংপুরে পৌঁছেও যাব। তার আগে আমাদের বাস কি শেরপুরে থামবে? আমি কি শেরপুরে নেমে আম্মার জন্য দই কিনব?
কিন্তু ভদ্রলোকের নাম তো জিগ্যেস করা হলো না।
নাকি জিগ্যেস করেছিলাম। তিনি তার নামও বলেছিলেন। এতদিন পরের ঘটনা। আমি তো মনে করতে পারছি না।

তাহলে মাহবুব আজীজ, আপনি গল্প চেয়েছেন। আপনাকে আমি গল্প দিতে পারলাম না। একটা কলাম দিলাম। বা ধরা যাক, একটা চরিত্র দিলাম। এখন এই চরিত্র নিয়ে আপনি নিজেই কাজ করেন।
করবেন? চলেন না আমরা রৌমারী যাই। চিলমারী যাই। ওখানে এখনও অনেক মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে আছেন। এখন তাদের বয়স সত্তর বাহাত্তর। তাদের সাক্ষাৎকার নিই। দেখি যে তারা কেমন আছেন, কী করছেন। তাদের কতজনের মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট আছে, আর কতজনের নাই। যাবেন?
আপনি বলবেন, যাব। আমি বলব, থাক। যাব না। জীবন এখন বড়ই ব্যস্ততার।
আর কথা কী জানেন, আমাদের শৈশবের স্মৃতি হলো সবচেয়ে উজ্জ্বল উদ্ধার।
আমরা বাস্তবতার আঘাত থেকে পালাতে শৈশবের স্মৃতির শুশ্রুষা চাই।

কিন্তু ধরেন ১৬, ১৮, ২০ বছরের ছেলেগুলো যুদ্ধে গিয়েছিল। তাদের স্মৃতি তো যুদ্ধের স্মৃতি। তাদের শৈশব মানে তো যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। খেলতে খেলতে মরে যাওয়া।

শামসু মাস্টারের গুলি লাগল। তিনি বললেন, তোমরা চলে যাও। আমি কভার দিচ্ছি। আমি ফায়ার করতেই থাকব। তোমরা রিট্রিট করো।
মুক্তিযোদ্ধারা সরে আসছে।

শামসুর ক্ষত থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। বাংলার মাটি লাল হচ্ছে। তিনি আস্তে আস্তে অবশ হয়ে পড়ছেন। পড়তে পড়তে বললেন, জয় বাংলা। তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব।
তারপর তিনি মিশে গেলেন বাংলার ঘাসের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে, পানির সঙ্গে, নদীর সঙ্গে, ধানের ক্ষেতে...

আমাদের ধানের মধ্যে তার শরীরের হাড়ের ফসফরাস মিশে গেল। আমরা অন্ন খেয়ে পুষ্ট হলাম।
তার নাম কোথাও লেখা রইল না। আমার মুরুব্বি কিষাণ খাটেন, তিনি লিখতে জানেন না। যারা লিখতে জানেন, তারা সার্টিফিকেট লিখবেন।
স্মৃতিও লিখবেন কেউ কেউ...
কিন্তু...

থাক। কী হবে আর এসব বলে। মাহবুব আজীজ, আমরা বরং অন্য কথা বলি। অন্য কথা। বলি যে, আমরা ঈদসংখ্যা করব। তাতে গল্প লাগবে। আমি একটা গল্প দিতে পারলাম না। বরং একটি স্মৃতিকথা দিলাম। একটা বাস জার্নির।

বাস রংপুর থামল। আমি নেমে গেলাম। মুরুব্বি বাস থেকে নেমে কুড়িগ্রামের বাস খুঁজছেন। মডার্ন মোড়ে তখন সন্ধ্যা নামছে। চায়ের দোকানে বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিচ্ছে মানুষ। আমি একটা রিকশা নেব। আমাকেও চলে যেতে হবে...

আমি নিশ্চয়ই গন্তব্য চিনি। আমার মুরুব্বি সহযাত্রীও তার গন্তব্য চেনেন। অনেক রাতে ফিরবেন তিনি বাড়ি। জোনাকি জ্বলা পথে শেয়াল ডাকা রাতে তিনি তার বাড়ির পেছনের দাওয়ায় গিয়ে উঠবেন। হেঁকে উঠবেন, ও স্বাধীনের মাও বিপ্লবের মাও, ঘুমায়া পড়লা নাকি? আমি আসছি...
আমরা আমাদের গন্তব্য চিনি না...

প্রাণীদের মজার কাণ্ড

শরীফ খান

হইচই করতে করতে ৪/৫ জন ছেলেমেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এলো আমার কাছে। আমি বসে আছি আমার নির্মীয়মান বাড়িটির পাশের কাঁঠালগাছের ছায়ায়। ওদের একজনের হাতে মস্ত বড় একটা সুন্ধি বা ফোঁটা কচ্ছপ-আমি ওটার ছবি তুলব, ওদেরকে চকোলেট দেব-এই হচ্ছে ওদের আশা। গ্রামে গেলে এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। সবাই জানে, আমি বন্যপ্রাণী দেখতে চাই, ছবি তুলতে চাই। জানা গেল, কচ্ছপটি বড়শি গিলেছিল। মোল্লাদের পুকুরপাড় থেকে ওরা কচ্ছপ নিয়ে ছুটে এসেছে। আমার পাশে বাংলাদেশ ওয়াইল্ড লাইফ ক্লাবের শিপলু খান ছিল। সে ছুটল ক্যামেরা ও মাপ-জোখ-ওজন নেওয়ার যন্ত্রপাতি আনতে। হাতে নিয়ে কচ্ছপটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলাম। বহু বছর বাদে পূর্ণবয়স্ক এই প্রজাতির কচ্ছপ আমি দেখলাম। স্কুল জীবনে বড়শি, খেপজাল আমিও বাইতাম। কচ্ছপ পেলে চটের বস্তায় পুরে রাখতাম-স্কুলের হিন্দু স্যারদের দিলে দুষ্টুমি বা পড়া না পারার কারণে বেত বা অন্য শাস্তি কম পেতাম। আহারে! জালিবেতের সপাং সপাং বাড়ি! নিলডাউন। বেঁচে থাক বাবা কচ্ছপরা।

শিপলু এলো। মাপ-জোখ-ওজন টুকে নেওয়া হলো। এখন আবার পুকুরে ছেড়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু চট করে শৈশবসুলভ দুষ্টু বুদ্ধিটা ভর করল আমার মাথায়। মাত্র গত পরশুই গ্রামের বিখ্যাত মল্লিকদের বাগানের বাঁশমহালের গোড়ায় শিয়ালের গর্ত দেখে এসেছি পাঁচটা-একেবারে দুর্ভেদ্য সুড়ঙ্গ। ওগুলোর ভেতরে বাচ্চাও আছে। বাচ্চারা এখনও মা-বাবার সঙ্গে রাতের অভিযানে বেরুবার বয়সী হয়নি। দুধ পান কর আর দিনভর ঘুমাও-ঝিমাও। ভর দুপুরে বা শেষ বিকেলে গর্ত থেকে বেরিয়ে খেলায় মাতো। হুড়োহুড়ি-দৌড়াদৌড়ি আর আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের অভিনয় কর-এতে শরীরের ব্যায়াম যেমন হয়, তেমনি আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের কৌশলটাও রপ্ত হয়ে যায়। কখনও কখনও মা-বাবা আন্টি-আঙ্কেলরাও যোগ দেয় খেলায়-জীবনের ট্রেনিং তো দিতে হবে ছানাদের। পোষা কুকুর-বিড়াল থেকে শুরু করে বাঘ চিতাবাঘ-গেছোবাঘ-মেছোবাঘ-চিতাবিড়াল-ছোট পাখি খাওড়া (Marbled Cat)-বনবিড়াল-খেঁকশিয়াল-ছোট বেজি-বড় বেজিসহ অনেক বন্যপ্রাণীই ছানাদের জীবনের ট্রেনিং দেয় খেলাচ্ছলে। পরশু গোধূলিবেলায় ঝাঁকড়া আমগাছের ডালে বসে আমি আর শিপলু বাঁশমহালের তলায় বিশাল মঞ্চে ওই খেলাটা দেখে এসেছি।

অতএব..! কচ্ছপটি চটের থলেতে ভরা হলো। ছেলেপুলেদের কুড়ি টাকা দিয়ে বিদায় করা হলো। জোগাড় করা হলো বড় একটা প্লাস্টিকের নীল গামলা। বেলা ৪টায় মোট চারজন আমরা ঢুকে পড়লাম মল্লিকদের দুর্গম-দুর্ভেদ্য বাগানের মাঝখানে। গামলাটা রাখা হলো শিয়ালদের গর্ত থেকে অল্প দূরে; গত পরশু যেখানটায় বেরিয়ে এসে খেলায় মেতেছিল পিচ্চি ছানাগুলো! যা সুন্দর দেখতে না ওদের! বোকা বোকা চাহনি! দুষ্টুর শিরোমণি। মা-বাবা তো সন্ধ্যার আগে আগে ছাড়া বেরোয় না গর্ত থেকে। ওরা ঘুমিয়ে আছে এই সুযোগটা নিয়ে শিয়াল ছানাগুলো বেরিয়ে এসে জবর খেলায় মাতে।

গামলার মাঝখানে একখানা আস্ত ইট রাখা হলো, যাতে কচ্ছপ গামলাটা কাত করে বেরিয়ে আসতে না পারে। সাবধানে জল ঢেলে গামলার চারভাগের এক ভাগ পূর্ণ করা হল। তারপর চটের বস্তা থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো গামলার জলে কচ্ছপটা। দু'জন চলে গেল। শিপলু চড়ে বসল গত পরশুর সেই ঝাঁকড়া আমগাছে। আমি বসলাম আন্দাজ গামলা থেকে ৩০ ফুট দূরে-ঝড়ে কাত হয়ে পড়া একটি বাঁশের ওপরে দু'পা ঝুলিয়ে, আমাকে পুরোপুরি আড়াল করে রেখেছে ৮-৯ ফুট উঁচু ৪-৫টি সুপারির চারা। শিয়াল ছানাগুলো দেখতে পাবে না আমাকে। বাতাস বইছে বাগানের মাথার ওপর দিয়ে সড়সড় শব্দে, বাঁশমহালে ঢেউ যেন জাগছে বারবার। বাজছে 'বাঁশ-কঞ্চি সঙ্গীত'। বাঁশ-কঞ্চিরা যেন ধ্রুপদী নাচও দেখাচ্ছে। যে বাঁশটায় বসেছি আমি আরাম করে দু'পা ঝুলিয়ে, সেটা আমাকে বারবার ওপর-নিচ ও এদিক-সেদিক দোলাচ্ছে। আহারে 'সুখ দোলা' ! আমার মনে হচ্ছে, জনবসতি থেকে বহু বহু দূরের কোনো আদিম জঙ্গলে বসে আমি। মনে পড়ছে এই মল্লিকদের বাগানের কত স্মৃতি! আমার শৈশবেও এই বাগান (ষাটের দশক) দু-একটা বুনো শূকর-শজারু-বাগডাশা, গো-বাঘ (Fishing Cat), চিতাবিড়াল (Leopard Cat) ছিল। ও সময়েই এক জোড়া অজগর সাপে ৬০/৭০টি ডিম পেড়ে, সেই ডিম পেঁচিয়ে পড়ে ছিল ওদিকের একটা বাঁশঝাড়ের গোড়ার ঝোঁপঝাড়ে ঢাকা ডোবার কিনারে। গ্রামবাসী সাপ দুটি মেরে ফেলেছিল (আমার নানার সঙ্গে এসে আমিও দেখেছিলাম সাপ দুটি মারার দৃশ্য)। ভেঙে ফেলেছিল রাজহাঁসের ডিমের মতো বড় বড় সব ডিম। প্রতিটি ডিমেই ছিল বাচ্চা (২-৫ দিনেই ওরা ডিম ভেঙে বাইরে আসত) সব এক জায়গায় জড়ো করে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছিল গ্রামবাসী; আদিম উল্লাসে। এই বাগানে সত্তরের দশকে একটি পলাতক পুরুষ হরিণ আশ্রয় নিয়েছিল-অনেক চেষ্টায় আমার বাবা রাতের বেলায় প্রাণীটির হীরক-খণ্ডের মতো জ্বলন্ত চোখ দেখে এলজি কার্তুজে গুলি করে মেরে ফেলেছিলেন। আমাদের গ্রামের একজন বড় কোনো চোরা শিকারির (সুন্দরবন) কাছ থেকে গোপনে মাঝেমধ্যে দু-একটা হরিণ আনতেন রাতের বেলায়। তার বাড়ি ছিল গ্রামের একটা নিভৃত অঞ্চলে; বড় একটি বাগানের কিনারে। বিশ্বস্ত লোকদের সে গোপনে বিক্রি করত সুন্দরবনের হরিণের মাংস। এক রাতে একটি শিঙ্গেল বা পুরুষ হরিণ কীভাবে যেন ছুটে গিয়েছিল। সে তো আইনের ভয়ে কাউকে বলতেও পারে না। গোপনে এসে বলেছিল আমার বাবাকে। বাবা তো রাতের বেলায় আমাকে আনবেন না মল্লিকদের বাগানে। আমিও নাছোড়বান্দা। সাপের কামড়ে মরি মরব, তা-ও হরিণ শিকার দেখব। আমাদের গৃহকর্মী গনি মিয়ার অনুরোধে যাওয়ার অনুমতি দিলেন বাবা। বাবা গুলি করার পরে ডাকাত ভেবে অনেকেই রাতে বাগানের পাশে এসে 'ডাকাত ডাকাত' চিৎকার জুড়েছিল। বাগানে ঢুকতে সাহস পায়নি কেউ । আমরা গেরিলা কৌশলে অত বড় হরিণটি নিয়ে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিলাম নিরাপদে। মাংসের ভাগ অবশ্য চোরাকারবারিকে দেওয়া হয়েছিল।

এই বাগানেই আমরা ক'বন্ধু সাদা বা আলবিনো মেছোবাঘ বা গো-বাঘা দেখেছিলাম। সেটাকে আমি বন্ধুকের গুলিতে শিকারও করেছিলাম। পরে ওটি নিয়ে একটি কিশোর অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসও লিখেছিলাম। আগ্রহীরা পড়ে দেখতে পারেন আমার লেখা বই 'সেরা কিশোর অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস' (ঝিঙেফুল প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা) বইটি।

গ্রামীণ বনের যত বন্যপ্রাণী তার সবই সেই ৬০-৭০ এর দশক পর্যন্ত টিকে ছিল এই বাগানে। ২০১৬ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল তিন প্রজাতির খাটাশ (Civet), শিয়াল, বনবিড়াল, গুইসাপ (৩ প্রজাতি), কুচিৎ দেখা যায় দু-এক জোড়া বুনো খরগোশ, বড় বেজি (Indian Gray Mongoose), ছোট বেজি। তবে, পাখি-বৈচিত্র্য তেমনই আছে, যেমন ছিল আমার

বাল্য-কৈশোরে। এই বাগানেই সেই যুগ যুগ ধরে আছে বা দেখা মেলে হালতি (Hooded Pitta) ও রাঙা হালতি (Slaty Legged Crake)। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এই দুই প্রজাতির বাসা-ডিম-ছানা বাংলাদেশের অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি, শুধু আমার গ্রাম সাতশৈয়া (ফকিরহাট, বাগেরহাট) ছাড়া। আমার গ্রামে ওরা যুগ যুগ ধরে ডিম-ছানা তুলে আসছে। ১৯৯৩ সালে এই বাগান থেকেই আমরা এ দুটি পাখির প্রামাণ্য ভিডিও ছবি নির্মাণ শুরু করেছিলাম; শেষ হয়েছিল ২০০৩ সালে। ওর একটি ভিডিও ছবির ২০০৫ সালের ১৪ অক্টোবর ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলাম। প্রধান অতিথি ছিলেন বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ কাজী জাকের হোসেন। ছিলেন প্রাণীবিজ্ঞানী নূরজাহান সরকার, শিল্পী হাশেম খান, কবি বেলাল চৌধুরী, লেখক-প্রকাশক মফিদুল হকসহ অনেকে। আমাদের এলাকায় আরও তিন প্রজাতির পাখির আধিক্য আছে-দিনেকানা, নাগরবাটাই ও শ্যামা।

কাত হওয়া বাঁশের ওপরে বসে থেকে অনেক স্মৃতিই মনে পড়ছে। বেলাও গড়াচ্ছে। এই বুঝি বের হয় পণ্ডিতের ছানাগুলো। কচ্ছপ দেখে ওদের কী প্রতিক্রিয়া হয়, আমাদের দেখার বিষয় আজ তাই।

একটি শ্যামা হঠাৎ কোত্থেকে যেন এলো আমার কাছাকাছি। অবশ্য এতক্ষণ যাবৎ আমি দূরে-নিকটে শ্যামার সুরেলা শিষ ও জতরঙ্গের মতো ডাকের গলা শুনছিলাম। এই শ্যামাটি আমাকে দেখেই একখানা কঞ্চিতে বসতে গিয়েও বসল না। ওপাশের গোলাপ জামের ডালে বসে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল। বুঝে ফেললাম, আশে পাশেই বাসা ওর, সে বাসায় ডিম বা ছানা আছে। পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে একটু এদিক-ওদিক তাকাতেই একটি মরা মোটা বাঁশের খোলের (মিস্ত্রি পাখি কাঠঠোকরার কাজ) ভেতরে ডিম দেখতে পেলাম, শ্যামার ডিম। যেটি চেঁচাচ্ছে, ওটি পুরুষ শ্যামা। বাসা আমার কাছ থেকে ডানদিকে আন্দাজ ১১ ফুট দূরে। ব্যাটা যদি আমাকে শত্রুজ্ঞান করে তো 'শিয়ালছানা-কচ্ছপের মজার খেলা' দেখার কম্ম কাবার। ছানাগুলো বেরিয়ে শ্যামার চেঁচামেচি ও চোখের চাহনি তথা শ্যামার ইশারা ভাষা পড়েই বুঝে ফেলবে-শত্রু (!) আছে ওখানে। পণ্ডিতের বাচ্চারা পণ্ডিতই হয়। ধূর্ত, বুদ্ধিমান, হুঁশিয়ার। গর্তে সেঁধিয়ে যাবে আবার।

না, শ্যামাটি কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করে বুঝল যখন মানুষটার কোনো খারাপ মতলব নেই, তখন ডাকল বউটিকে। শ্যামবউ এলো। আমাকে দেখল একবার। তারপর বাসায় ঢুকে বসে গেল ডিমে। শ্যামাবউয়ের চোখ আমার দিকে। পুরুষটি বুক মিশিয়ে বসল একখানা কঞ্চির ওপরে-ব্যাটা বোধ হয় পাহারা বসালো।

বেলা পড়ে আসছে। একটা বসন্তবৌরি দূরের কোনো গাছে বসে আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছে সূর্যকে। দক্ষিণ দিক থেকে ভেসে আসছে একটি দোয়েলের ভয়ার্ত ডাক ও চেঁচামেচি-সাপ দেখেই ভয় পেয়েছে ওটা। ওর সঙ্গী অনেকটাই সরু কণ্ঠে লম্বা লয়ের শিষ বাজিয়ে আশপাশের সব পাখিকে সতর্ক করে দিচ্ছে। একটি ফটিকজল আমার পেছন দিকের সোনাল গাছটিতে বসে শিস বাজাচ্ছে বুক হিম করা। আশপাশেই ওটার বাসা আছে-ডাকের ভাষাতেই সে খবর লুকিয়ে আছে।

দোয়েলটা সামনে চেঁচিয়ে চলেছে। এই বাগানে আজও যথেষ্টই আছে বিষধর গোখরা, খড়ম গোখরা বা খইয়া গোখরা ও সাপনী সাপ (এদের খাদ্য বিষধর-অবিষধর সাপ)-নিজেও দারুণ বিষধর, দাঁড়াশ সাপ। দাঁড়াশে পাখিদের ডিম-ছানা খায় গাছে চড়ে।

আমি পেছন দিকে বেশ দূরে পাখিদের মিছিল-স্লোগান শুনে বুঝলাম-দোয়েলটি সাপই দেখছিল। সিগন্যাল পেয়ে এসে পড়েছে অন্য ছোট ও মাঝারি পাখিরা। তাড়া করে নিয়ে চলেছে শত্রুকে-শত্রুর পিঠের ওপরে উড়তে উড়তে। কাছাকাছি হতেই আমার ঘাড়টা বেকায়দায়ভাবে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেখি-সাত-আট লম্বা দাঁড়াশ সাপকে মিছিল-স্লোগানে তাড়িয়ে নিয়ে চলে ১০/১২টি পাখি। ওই দলে আছে ভাত শালিক-ঝুঁটি শালিক-নীলরাজা-নাচুনে-বুলবুলি ও একটি মাত্র ফিঙে রাজা। সবাই সাপটিকে গালাগাল ঝাড়ছে সমানে। এলাকাছাড়া করতে চাইছে। পুরুষ শ্যামাটি যেন ছিটকে উঠল ওপরের দিকে। বাসার সামনে এসে চেঁচিয়ে ডিমে বসা বউটিকে যেন বলল কিছু (হয়তো বলল: তুমি চুপচাপ বসে থাকো শ্যামাবউ! ওই যে বসে আছে মানুষ শত্রু!), তারপর তীরবেগে উড়ে গিয়ে শামিল হলো মিছিলে। এ রকম সুন্দর দৃশ্য আমি বহু বছর বাদের আবার দেখলাম।

বসে আছি তো বসেই আছি। খুদে খুদে মশার কামড় খেয়ে চলেছি। হাত-পা জ্বলছে। থাপ্পড় দেওয়ার জো নেই। ডলে-পিষে মারছি। চোখ কিন্তু শিয়ালের গর্তগুলোর দিকে। একটু বেখেয়াল হয়েছি-শ্যামাবউয়ের দিকে তাকাতে গিয়ে মাথার ওপর থেকে ভেসে এলো দোয়েলের শিস। সামনে তাকাতেই দেখি তিনটি গর্তমুখে তিনটি শিয়ালছানা। গর্ত থেকে ঘাড় পর্যন্ত বের করে চারপাশে তাকিয় পর্যবেক্ষণ করছে আশপাশে কোনো বিপদ লুকিয়ে আছে কি-না! কান খাড়া করে এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে, তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে চারপাশ। নাকে বাতাস টানল। বিপদ নেই বুঝে যেন দুটি ছানাই ছিটকে বেরুল গর্ত থেকে। সে কী লম্ফঝম্প আর ঝরা বাঁশপাতার ওপরে গড়াগড়ি! পুড়পুর করে পাঁচটি গর্ত, তাই বেরিয়েই জড়াজড়ি-হুড়োহুড়ি আর লাফালাফি। মাথার ওপরের ঝাঁকড়া আমগাছ থেকে শিস বাজিয়ে আমাকে সংকেত দিয়েছিল শিপলু। আবারও সংকেত দিয়ে বোঝাতে চাইল-ছানা ভেতরে আরও আছে।

ছানাগুলো দৌড়াদৌড়ি করছে। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ ও বীরবিক্রমে মারামারি-গড়াগড়ি করছে। কী ফুর্তি ওদের! সামান্য শব্দেই সব স্ট্যাচু হয়ে যাচ্ছে, কান পাতছে; আবারও মাতছে মজার খেলায়। এ রকম মজমার খেলাও আমি দেখিনি বহু বছর। কিন্তু নীল রঙের গামলাটি দেখলেও ওরা কোনো কৌতূহল দেখায়নি। ভ্রুক্ষেপই যেন নেই। অচেনা জিনিস। সন্দেহ তো হবারই কথা! হ্যাঁ হলো-একটি ছানা পা টিপে টিপে এগোল। গামলার ভেতরে উঁকি দিয়েই ভয়ে একটা চাপা চিৎকার দিয়ে উল্টে পড়ে পড়িমরি দৌড়ে সুড়ুত করে ঢুকে পড়ল গর্তে। কিছু না বুঝেই অন্য দু-চারটি বাচ্চা ঢুকে গেল। অবশ্য বেরিয়ে এলো ওরা সহসাই। সব মিলে প্রবল সন্দেহ আর ভয় ভরা চোখে গামলা ঘিরে চক্কর ও উঁকিঝুকি মারছে-কচ্ছপ তো সেই প্রথম থেকেই অনবরত চেষ্টা করে চলেছে গামলা থেকে বেরুতে। ছানাগুলোর চোখে মুখে ভয় বিস্ময় ও অপার কৌতূহল-কী এটা ! যে প্রাণীকে যে কোনো বন্যপ্রাণী, বিশেষ করে শিকারি বন্যজন্তু, তারা আগে দেখেনি সেই অচেনা প্রাণীকে আক্রমণ করতে ভয় পায়। যদি ঘটে কোনো বিপদ! এটা বন্যজন্তুদের জন্মগত স্বভাব। ছানারা পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে-যেন শলা-পরামর্শ করছে-কী করা যায় এখন! নির্ভয়ে খেলবে, না গর্তে সেঁধিয়ে যাবে! নাকি মা-বাবাকে ডেকে আনবে! না, ডাকতে হলো না; একটি শিয়ালনি গর্ত থেকে বেরিয়ে প্রথমে ডন বৈঠক কষে শরীরের সারাদিনের আড়ষ্টতা কাটিয়ে নিল। সব ছানা ছুটে এসে তার কাছে জড়ো হয়ে যেন অচেনা প্রাণীটির কথা বলল। শিয়ালনি দেখল নীল গামলাটি-সোজা এগিয়ে গিয়ে দেখল কচ্ছপটিকে, তাকালো এদিক-ওদিক (মানুষ ছাড়া তো এই নীল জিনিস অন্য কারও ঘরে থাকে না), তারপর নির্বিকার ভঙ্গিতে পা দিয়ে গামলাটি উল্টে দিল। কচ্ছপটিও এতক্ষণে মুক্তি পেয়ে দৌড় দেওয়ার চেষ্টা করল। অমনি

ছানাগুলো মহা আনন্দে ঘিরে ধরল কচ্ছপটিকে। কচ্ছপ তো বিপদ বুঝে ঘাড়-মাথা ভেতরে টেনে নিয়ে চুপ। ও মা! শিয়ালছানারা ভেবে পাচ্ছে না-মাথাটা গেল কোথায়! তবুও পণ্ডিতের বাচ্চা বলে কথা ! সব বাচ্চা মিলে পা ও মুখ দিয়ে ধাক্কা দিতে শুরু করল কচ্ছপকে। একবার উল্টে দিচ্ছে আবার উপুড় করে দিচ্ছে। ওই মা শিয়ালটি কিন্তু দূরে বসে নির্বিকারভাবে পা ও শরীর চাটছে। রাতের অভিযানে বেরুতে হবে তো কিছুক্ষণ পর। সে তো ভালো করেই জানে, সারাদিন চেষ্টা করেও কচ্ছপটির কচুও করা যাবে না।

টানা ১০ মিনিট ছানাগুলো যেন ফুটবল-হকি খেলল কচ্ছপটি নিয়ে। ওদিকে শিয়ালরা সব গর্ত থেকে বেরুচ্ছে। ওরা দেখল কচ্ছপটি, কিন্তু কোনো কৌতূহলই নেই। নেই তার কারণ, কচ্ছপদের কিছুই করতে পারে না শিয়ালেরা। উল্টোপাল্টে দিতে পারে, কামড় দিতে পারে, কচ্ছপদের কিছুই হয় না। অতএব, অপচেষ্টা।

ছানাগুলো যার যার মায়ের দুধের বাঁটে হামলে পড়ল। এ বেলার মতো দুধ পান করবে। এই সুযোগে কচ্ছপটি মাথা বের করে প্রায় দৌড়ে চলল সামনের দিকে (অনুমান ২৫ গজ দূরে মস্ত বড় ডোবা আছে একটা, কচ্ছপরা কি দূর থেকে জলের গন্ধ পায়?)। ৫/৭ গজ এগোতেই ছানাদের নজরে পড়ল-দে দৌড় দুধের বাঁট থেকে মুখ খসিয়ে; সামনে থেকে হাস্যকর ভঙ্গিতে বেড় দেওয়ার চেষ্টা করছে সব কটি ছানা। না, মরিয়া কচ্ছপ এগিয়ে চলেছে যুদ্ধ-ট্যাঙ্কের মতো। একটি ছানা দিল ডান পায়ের খোঁচা। না-ট্যাঙ্কের গতি থামল না। কচ্ছপটির জীবন বাঁচানো বলে কথা! ফিরে এলো ছানারা। আবারও দুধের বাঁটে মুখ। দুধ আর পান করতে দিতে চাইছে না শিয়াল মাতারা। রওনা হলো গামলার দিকে নাছোড়বান্দা ৫/৭টি ছানা দুধের বাঁট ধরেই ঝুলতে ঝুলতে চলল।

সব কটি শিয়ালই প্রথমে নীল গামলাটি শুঁকে দেখল ভালোভাবে। তারপর পুরুষ আর মেয়ে শিয়ালগুলো একে একে যার যার ভঙ্গিমায় প্রস্রাব করল গামলার ভেতরে। বাইরে হয়তো সূর্য এখন পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝুলে গেছে আকাশের কার্নিশে, কিন্তু মল্লিকদের বাগানে নেমে গেছে অন্ধকার। নামা চলবে না আমার আর শিপলুর। তাতে শিয়ালদের দলবদ্ধ আক্রমণে মারাত্মক আহত হওয়ার আশঙ্কা ষোলো আনা। অতএব, মোবাইলে কল। টর্চ হাতে এলো ৫/৭ জন। নামলাম গাছ থেকে। বাঁশতলা সুনসান। কে বলবে-এখানেই একটু আগে অনেক শিয়াল ও ওদের ছানারা ছিল! গামলাটি রেখে এলাম শিয়ালদের 'বাথরুম' হিসাবে। চারদিক থেকে ভেসে আসছে দিনকানা পাখিদের ডাক।

প্রকৃতিতে বন্যপ্রাণীরা নানা রকম মজার মজার কাণ্ড ঘটায়, জীবনে তা দেখেছিও বহুবার। এ বিষয়ে আমার লেখা 'প্রাণীদের মজার কাণ্ড' নামক বইও আছে বাজারে (ঝিঙেফুল প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা)। আগ্রহীরা পড়ে দেখতে পারেন। মজার কাণ্ড কিন্তু কৌশলে তৈরি করে নেওয়াও যায়-সেটাই আমি বললাম আপনাদের এতক্ষণ।

আরও কিছু শিয়াল কাণ্ড

১. শৈশব-কৈশোর ও তরুণ বেলায় আমরা বন্ধুরা মিলে একটা মজার খেলা তৈরি করতাম। প্রতি কোরবানির ঈদের রাতে। কোরবানির গরুর হাড্ডিগুড্ডি চটের থলেতে ভরে বাগানের কিনারের গাছের ডালে এমন উচ্চতা বা কৌশলে ঝুলিয়ে দিতাম, শিয়ালরা পেছনের দু'পায়ের ওপরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েও যাতে সামনের দু'পায়ের নাগাল না পায় সহজে।

সন্ধ্যার পরই আমরা আশপাশের গাছগুলোতে চড়ে বসতাম। শিয়ালরা রক্তের গন্ধে পাগলের মতো এসে জুটত। সবাই মিলে লম্ফঝম্প দিয়ে থলেটা পেড়ে ফেলতে চাইত; পারত না। ঘড়েল শিয়ালগুলো লাফ দিয়ে দাঁতে চেপে ধরত থলে, তারপরে টেনে-ছিড়ে নামানোর জন্য সে কী প্রাণান্ত চেষ্টাই না করত। কৌশল খাটাত-ঘুরত একদিকে, তারপরে পাল্টা ঘূর্ণন। আমরা দেখতাম-আশ্চর্য সুন্দর ঘূর্ণিনৃত্য। কখনও সফল হতো, কখন হতো না। কাঁঠালের খোলসের ভেতরে দু-চার কোয়া কাঁঠাল রেখেও এমন মজার খেলা আমরা জমাতাম।

২. মাঠের মাঝখানে খড়বনে থাকা ৬/৭টি শিয়াল বেশ অত্যাচার করছিল গেরস্ত বাড়িতে (১৯৬৭), আমি আমার প্রিয় কুকুর সংকর জাতের টাইগারকে নিয়ে খড়বনের পাশে গেলাম। সঙ্গে টাইগারের ভাই কালুও আছ। আমার সঙ্গের চাচা সম্পর্কীয় লোকটির ছাগলছানা মেরেছে গত রাতে-তিনটি। ছাগল মাতার কান্না তো আছেই-দুধের বাঁটের ওজন ও জ্বালায় অস্থির ওটা। দুধ দুইয়েও জ্বালা কমানো যাচ্ছে না। দুধেল ছাগল ওটা। চাচা তাই ক্ষেপে আছেন। টাইগার আর তার ভাইকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো নিবিড়-ঘন খড়বনে। একটু বাদেই হাঁকডাক-ধস্তাধস্তি ও খড়বন তোলপাড়। খড়বনের কিনারে ছিল ঝড়ে বেকায়দায় কাত হয়ে পড়া একটা নারকেল গাছ। হঠাৎ দেখি ওটাতেই চড়ে বসেছে তিনটি শিয়াল। দারুণ দৃশ্য! নিচের টাইগার কালুর হাঁকডাক। আমরা ঘুরপথে গেলাম। প্রমাদ গুণল শিয়াল তিনটি-নিচে তো খোলা মাঠ। অমনি তিনটি শিয়ালই যেন পরিকল্পিতভাবে ওয়ান...টু...থ্রি গুনে লাফ দিয়ে ৬-৭ ফুট উঁচু থেকে) পড়ল কালু টাইগারের লেজ নামিয়ে দে দৌড় ঝেড়ে-এ রকম আজব আক্রমণের মুখোমুখি তো তারা আগে হয়নি!। শিয়াল তিনটি অদৃশ্য খড়বনে। একেই বলে পণ্ডিতি বুদ্ধি।

৩. মাঠে বাঁধা ছাগল-বাছুর-ভেড়া বা মাঠে চরতে থাকা রাজহাঁসের সামনে এসে দুটি শিয়াল বিচিত্র খেলায় মাতে, দৌড়ায়। প্রাণীদের কাছে যায়-ভাব জমানোর অভিনয় করে। তারপর দাঁতে দড়ি ছিড়ে-কেটে যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন) আলতোভাবে খেলতে খেলতে ঝোপঝাড় বাগানের দিকে নিয়ে যায়। প্রাণীগুলোও বোকার মতো চলতে থাকে। ছাগলের কান ধরে টানে একটা, অন্যটা পেছন থেকে ঠেলে মুখ দিয়ে। রাজহাঁসের ধরে গলা; আলতোভাবে। জায়গামতো নিয়ে মেরে ফেলে। খোলা মাঠে এরা এই জন্য মারে না যে, প্রাণীটা চেঁচালে মানুষ বা কুকুরের নজরে পড়বে, সে ক্ষেত্রে শিকার তো দূরে থাক-জান বাঁচানোই দায়। এ রকম দৃশ্য দেখেছেন এ রকম বহু মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে গ্রামবাংলায়।

৪. ছোট খেজুরগাছের রসের ঠিলার দড়ি দাঁতে কেটে নামিয়ে রস পান করার জন্য ঠিলার ভেতরে ঘাড়-মাথা সেঁধিয়ে দিয়ে (আর কি বের করা যায় গলা-মাথা?) শিয়ালদের 'কলুর বলদ' দশাও গ্রামবাংলার অনেকে দেখেছেন। আবার, বন্যা বা জলাবদ্ধতার সময়ে শিয়ালদের বড় বড় গাছের মোটা ডালে চড়ে বসে থাকতেও দেখেছেন অনেকে। ১৯৮৮ সালের বন্যার সময় আমার এক অফিস বন্ধু বললেন-তার গ্রামের (দোহার, ঢাকা) একটা বয়সী মোটা আমগাছের ডালে মোট ১১টি শিয়াল, তিনটি গাছখাটাশ (Palm Civet) ও গোটা সাতেক গুই সাপ আশ্রয় নিয়েছে। গিয়েছিলাম দেখতে। আহারে করুণ-সুন্দর দৃশ্য!। আমার লেখা 'প্রাণীদের মজার কাণ্ড' বইটিতে অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে শিয়াল ও খেঁকশিয়াল নিয়ে মজার মজার ঘটনার বর্ণনা আছে। তবে, আমার বিচারে শিয়ালের (Jackal) চেয়ে খেঁকশিয়াল বেশি পণ্ডিত। আমি বলি খুদে পণ্ডিত (Bengal Fox)। ঈশপের গল্পের শিয়ালেরা হলো এই খুদে পণ্ডিতরা।

The Tale of Tall Talks

Md Abdul Awal
Assistant Professor
Department of English

After the disappearance of Mr Jasim, his eldest son Md Babu who was assigned to take care of everything according to the law of the country makes a mess. Babu's father Mr Jasim was a good human being in a word. He married a woman named Jannat whose father was also a landlord who died a few months ago. Jannat was the only daughter of that landlord. Now Babu has to take care of the two lordships as he got inherited from his father's-in-law one. He along with his all family members was living very happily. For much more entertainments Babu was thinking of appointing some more comedians for the amusements of his palace. The advertisements for appointing comedians were circulated everywhere through different newspapers. Very soon a rich numbers of the applicants reached at the palace. The applicants were given oral tests by groups. Three persons who tasted earlier are selected for the final competition. According to terms and conditions of the advertisement, three selected persons would tell two of their best jokes. The best comedians would be chosen by the presence and the hired judges. The palace is adorned with a new colorful look on the very day. The distinguish guests, relatives of the landlords and other people were present while the candidates are being called to tell their jokes one by one.

1st Candidate who is called Babu with his 1st joke.

I am Babu from Rangpur, Honorable landlord; distinguished guests and the presence take my salam and very good afternoon to you all. My first jock's name is about "The Glory of my Ancestor". I have heard it from my grandfather and he had had that from his ancestors who were the best warriors in the cosmology. He said that they had big, big horses by which they could have easily subdued their opponents. "Had they supernatural powers"?, asks one of the spectators. If they (ancestors) thought of overwhelming any country or enemy they easily could have. "How"?, asks another on lookers. If they (ancestors) faced even any ocean on the way to the battle field, the horses began to sip and continued until the ocean dried up then they would go to spot, fight and get victory and if it

was noticed that any enemy attacked from the back of the horses, the horses started urinating for this the opposition parties flew away by the horses' urine flow. But it is a matter of great sorrow that the horse had to die of only few drops of rain. Since then our ancestor's domination had gone to dogs. Therefore I'm here for the post. Thanks all.

2nd Candidate with 1st joke, He is Nayem.

I am Nayem from Sirajgong, Honorable landlord; distinguished guests and the presence take my salam and very good afternoon to you all.
My joke is about "Mare's Nest".

People say Vidyasagar used to read in the light of lamppost. Shakespeare, the greatest dramatist used to read in the light of lantern. Newton, the greatest scientist of the world used to read in the light of candles. What a kind of fun! dear audience. What did they do in the daylight? Answer me. Did they cut grasses for horses in the daylight?"

3rd Candidate with 1st joke, He is Mashuk.

I am Mashuk from Madaripur, Honorable landlord, distinguished guests and the presence take my salam and very good afternoon to you all.
My joke is about "Neither Fish Nor Fowl"

"Assalamualaikum. Don't mind my dear friends. Valentine day has come from the Christian culture. Islam doesn't allow it because of having non Muslim activities. So we should try to avoid this non Islamic ceremony. Happy Valentine's Day to you. Happy Valentine's Day!"

The first round was over. Now the second round started.

1st Candidate with 2nd joke.

Thank you Honorable land lord for giving me floor again, distinguished guests and the presence take my salam and very good afternoon. My second jokes is about "Tall Tale".

I have heard from my grandparents and they had had it from their ancestors that their predecessors had so big a cattle farm house that if a cow begot a calf in one corner and before going to reach the other corner of the farm house the calf became a completed ox. Thanks all.

2nd Candidate with 2nd joke. Honorable land lord, distinguished guests and the presence take my salam and very good afternoon to you all. My second jokes is about "Next to Nothing". I have heard this tall tale from my grandfather and he had had it from his ancestors that one of his ancestors was so tall that he managed his bath from the water of the cloud". "How is it possible?", asks one of the presences. The man had long sticks in which he just tied jars at the top of sticks and collected water from the cloud as much as he needed for his bath. Thank you very much.

3rd Candidate with 2nd joke. Honorable land lord, distinguished guests and the presence take my salam and very good afternoon to you all. My second joke is about "A beggar".

A beggar says to a man, "Sir, give me 10 taka".
"What will you do taking 10 taka"? replied the man.
Beggar: "I'll take tea".
Sir: "For a cup of tea you need 5 taka only. What is about the rest of the 5 taka?"
Beggar: "Sir, I'll offer a cup to my girl friend."
Sir: "What? Being beggar, you have already managed a girl friend".
Beggar: "No. Sir, pardon me, that girl friend has made me a beggar".

The landlord orders the coward to hold the comedians, bind them beneath the tree, hung and bit them until they die. The meeting ends with the saying of Babu that these are the cook and bull stories.

ভালো মেয়েটি

রেজিয়া খানম
কোর্স সেক্রেটারি, আইন বিভাগ

মেয়েটি খুব খুশি, লোভ দেখিয়ে কেউ সগর্বে নিজেকে ব্যবহারকারীর খাতায় নাম লেখাননি। হাজার শুকরিয়া। পথ বেশ মসৃণ। তবে মানুষ হতে নাকি বাকি। মানুষের সন্তুষ্টি পেতে বাকি। পথ চলা, সংসারের দেখভাল করতে হোঁচট লাগে। বিষম বেগ পেতে হয়। কানাকড়ি দিতে না পারায় অপূর্ণতা লাগে। উন্নত যোগ্য দাসী। অর্থ উপার্জন করে নাকি উপরি। এটা বাড়তি। নাকে খত দিয়ে চলতে হয় বলে চলা। কর্মক্ষেত্রে কর্তারা কেউ হায় হায় কেউ হিহি। যারা সুবিধা করছে তারা মিচকি হাসছে। ভাগ্য লাগে! বড় পদের স্বামী, চাচা মামা ইত্যাদি।

রাত-দিন ভাবে মেয়েটি, যোগ্যতার বিচার কী করে হবে ? উদ্যোক্তা হব - বেশতো। এতগুলো বছর ফিরে কি পাব? অতীতে ফিরে দেখি বারো বছর আগে মেধা তালিকায় অফিসার পদে ব্রাক ব্যাংকে কেন যোগদান করলাম না? অনলাইনে প্রকাশিত ফলাফল, আইডি নম্বর ৪২১২। মেয়েদের জন্য নাকি বিশ্ববিদ্যালয় বেশি ভালো। দুঃখ হোক কিন্তু বাস্তবতার মুখোমুখি। আমার পদ ও মাইনে হতো বর্তমানের চার গুণ। সততা, ধৈর্য, পরিশ্রম, সময়নিষ্ঠা, আদবকেতা, আন্তরিকতা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, প্রফেশনাল ডিগ্রী অর্জন, সুন্দরভাবে উপস্থাপন আর কত? কর্মক্ষেত্রে, সমাজ সংসারে কৃতিত্বের ভাগ সাতাত্তর ভাগ, কর্তৃত্বের বেলা নাই। কর্তৃত্ব করতে টাকা লাগে। লাগে পুরুষত্ব। পুরুষত্ব নেই বলে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি হয় না। মেয়েটির উন্নতি হলে পাছে পড়া একটি ছেলে আরো পিছিয়ে পড়ে। পড়তে দেয়া তো যাবে না। কেননা সমাজ সংসারে লাগাম ধরতে হবে ছেলেটিকে। মেয়ে তোমাকে উপযুক্ত করেছে, তাতে কী? রাজনৈতিক পরিচয়, মাংসপেশী আর কালোটাকা ও দুর্বৃত্তায়ন তোমার বেষ্টনীতে নাই। যতদিন না এসব থেকে বেরিয়ে আসব, স্বমহিমায় উঠে আসা যাবে কি? সুশাসন সৌন্দর্য কিছুই আর রইবে না, কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধশ্বাস হয়ে আসছে। অপরদিকে হে নর তুমি সুখী, শান্ত? উত্তরে আপনাদের ভালো আমি চাই। মেয়েটির নিরুত্তর ভাবে, আমিও যে ভালবাসি দায়িত্ব। দায়িত্ব সুচারু হয়েও কর্তৃত্ব অস্পষ্ট, অব্যক্ত, ভালো লাগে না।

আর কত দেখব ? পুড়ে পুড়ে অবশিষ্ট ছাইটুকু বাতাসে উড়ে গেল। পৃথিবীটা যেন ধুলোময়। সৌরমন্ডলও যেন আর পারছে না। মাটি ও আকাশ যেন একাকার মিশে যাবে। আমাদের অত্যাচারে আমরা বিষাক্ত হয়েছি। পরিবেশমন্ডল এত ভার, এত চাপ সইতে পারছে না। বিজ্ঞানীরা গুনছেন পৃথিবীর অস্তিত্ব আর কতদিন।

কর্তৃত্ব যে মেয়েটির সে নাকি বিকিয়েছে। নয়ত কড়া অভিভাবক রয়েছে তার পাশে। সবাই সব বোঝে, কাজ হয় না। হয়ত উদ্দেশ্য প্রায় একই। কর্তার অনিহা, তাই সুপারিশ করতে ভয় হয়, পাছে লোকে কিছু বলে।

পদ বা পদবী, বেতন কাঠামো কোনদিকে বাড়ে না। বাড়ে না যেহেতু দোষ তো আছে বটে। নয়ত খুশি করতে পারে না। বোকা । বোকার গলায় দড়ি। এই অদৃশ্য দড়িতে ঝুলছে দোদুল্যমান। সমাজ বোঝে না, বোঝে যখন কোপ আসে। তবুও বদলাক। মানুষকে ভালবাসা যায়, ঘৃণা নয়। মায়ের ভালোবাসা আর প্রতিবাদী মেয়েটার গুণে সমাজ বদলাচ্ছে। এখানেও কৃতিত্ব, কর্তৃত্ব নয়। সময়ের সাথে সব বদলায়, বদলাতে বাধ্য হয়। পৃথিবীতে যা কিছু কুৎসিত, এক চতুর্থাংশ যদি ঘটিয়েছে নারী, বাকি তিনভাগ নর! তবে হিতের বেলায় সমান দাবীদার জোর করে নেয়া। ভাল ও মন্দে একই সাথে চ্যাম্পিয়ন হওয়া দেখা মেলে নাই। স্পার্ম তথা নর অস্তিত্ব সংকটে। ধীরে ধীরে অনুর্বর থেকে অস্তিত্ব সংকটে। নিজের যত্ন নাও, সজাগ হও সংকট মোকাবেলায়। আমি পাশেই রয়েছি তোমার।

দক্ষতার সাথে উন্নয়নের যোগসূত্র নিবিড়। আর কপটতার সাথে অনুন্নয়নের যেমন। ক্লান্ত মন, তাই ঘুমিয়ে পড়ি। সময় এসেছে এবার জেগে উঠি। হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এসো করি কাজ, গড়ি সমাজ। বৈষম্যহীন সুন্দর মনন নিয়ে সব শিশুদের জন্য সমান বার্তা নিয়ে হাজির হই। আলো ও অন্ধকারে সদা হাসি মুখে এ পৃথিবীকে স্বাগত ও বিদায় জানাই।

The Trick of Loan

Azmain-ar-Rafi (Omi)
43rd Batch, CSE
ID: 163030101021

Once upon a time, There were two friends, named Matthew Gomage and Abu-Hossain-Al-Qasim (Qasim). Although, they are well in study, Matthew was a meritorious student and Qasim was an average student. After completing their study, they were thinking to do some business but they didn't have sufficient money; therefore, they went to a loan-giver Ben-Gal Shovonsky.

Ben-Gal asked Matthew, "Why do you want to do business?"
Matthew replied, "Sir. I want to do some business so that I can be able to earn money in the righteous way."
Now, Qasim was asked, "Why do you want to do business?"
Qasim replied, "So that I can earn some money."
Then, Ben-Gal lent Matthew 1000 pounds at 10% daily-interest-rate and lent Qasim 2000 pounds at 1% daily-interest-rate. But Both of them have some conditions from Ben-Gal :

1. Delay-rate would be 15% for both of them.
2. Loan validity is for 31 days and payment of loan is according to : Money=Principal $(1+\text{interest-rate})^{\text{day}}$.
3. If anyone of them couldn't pay loans at just time, he would have an answer for delay. For that case :

a) If he couldn't pay loan at just time for the righteous reason, he can pay loan according to :
Money=Principal$\{(1+\text{interest-rate})^{\text{day}}+\text{delay-rate})\}$

b) If he couldn't pay loan at just time for the wrong way, he have to pay loan according to :
Money = Principal $(1+\text{interest-rate}+\text{delay-rate})^{\text{interest-day}+\text{delay day}}$.

c) If one of them couldn't pay for the righteous reason and another couldn't pay for the wrong way, the second person should have to pay (according to section 3.b) and the first person's loan can be forgiven.

d) If one of them harms the money of another of them, the first person should have to pay (according to section 3.b) and the second person's loan can be forgiven.

4. The payment of loan shouldn't take place in the religious place but Ben-Gal's house.

Both of them accepted these conditions and went for their business. Matthew started a software-business and opened an application named "My Message". In that application, a person can have a chat with another-person and it can be the written-chat, the Audio-chat or the Video-chat. But if any persons have the violence in a chat to his client, the client can report the chat to authority and the authority can lock the violent person. Secondly, you can send your peaceful message to all and your violent message will be reported.

On the other hand, Qasim started a software-business and opened an application named "Risalt". In that application, only the written-chat is allowed and no violent chats or messages can be reported.

After 31 days, Matthew had earned 35,000 pounds as his profit where he had to pay 19,195 pounds and Qasim had earned only 3,000 pounds as his profit where he had to pay 2,723 pounds. Matthew calculated that he could save 15,805 pounds and Qasim calculated that he could save 277 pounds. Qasim had created a conspiracy against Matthew. Matthew lost his 3,5000 pounds and faced Ben-Gal as ashamed. Qasim had paid 2,723 pounds and before Matthew could say, Qasim had blamed that Matthew didn't want to pay the loan. When Ben-Gal saw Matthew's face, he understood that something was fishy. He managed to call ShanjibBachan to investigate about the case. In that case, after 10 days, when Shanjib finished his investigation, he know that Qasim looted Matthew's entire earned money by his some hired goons.

Finally, Ben-Gal decided, "Qasim have to pay totally 8,78,633 pounds and since he has paid 2,723 pounds, he has to pay 8,75,910 pounds more. On the other hands, Matthew's 15,000 pounds will be back to Matthew." Finally, Matthew got his 15,000 pounds back.

কালো মেঘে একটু রংধনু

নুর মোহাম্মাদ আরিফ
৪৮ তম ব্যাচ, ইইই
আই.ডি ঃ ১৮২০৩০৩০১০৪৩

রোজকার মত সেই ধরাবাধা সময় ৯টা- ৫টা অফিস। ক্লান্তিময় শরীরে বাসায় ফিরে একটু আয়েশ, টিভি দেখা তারপর ভোজন পর্ব সেরে বিছানার সাথে সন্ধি। এই ধরাবাধা নিয়মে কখনও সখনও খুব বেশি একঘেয়েমি লাগে। তাই বেশির ভাগ ছুটির দিনগুলোতে চেষ্টাকরি একটু প্রকৃতির মাঝে ঘুরে আসতে। রোজকার এই ব্যস্ততায় নিজেকে হারিয়ে ফেলি, নিজেকে নিজের মতো করে পাবার জন্য ছুটে যাই সবুজ প্রকৃতির মাঝে। প্রকৃতি কার না ভালো লাগে! কিন্তু এই ঢাকা নামক যান্ত্রিক শহরে বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকা ছাড়া বৃক্ষরাজির সংখ্যা একেবারেই অপ্রতুল। টুকটাক বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করি, বেশ কিছুদিন হল কলম চলছে না। তার অবশ্য একটা কারণ আছে, মনের মাঝে কিছু কষ্ট প্রেতছায়ার মতো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে আমাকে। শুক্রবার ছুটির দিন, আমার তিন-তলা রুমের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। কি মুগ্ধ করার মতো বিকেল আজ! এরকম বিকেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যে আনন্দ পাওয়া যায়। কিছুক্ষণ পর বাসা থেকে বেড়িয়ে রিকশা নিয়ে রাসেল স্কয়ার, তারপর রাস্তাটা পার হয়ে একটু পা বাড়িয়ে ধানমন্ডি-৩২ বঙ্গবন্ধু মিউজিয়ামের সামনে শানবাঁধানো ঘাটে গিয়ে বসি। সাথে আছে বন্ধুসূলভ আমার খুব কাছের ছোট ভাই, যাকে সর্বক্ষণ পাশে পাই। বাসা কাছে হওয়ায় এইখানটায় মাঝেমাঝেই আসি, শানবাঁধানো ঘাটে অথবা বামপাশের কড়ই গাছের নিচে বসা হয়। আজ ধানমন্ডি লেকের শানবাঁধানো ঘাটেই বসা হলো, এখানে পানির খুব কাছাকাছি বসা যায়। অন্যান্য দিনের মতো তেমন লোকজন নেই ঘাটে, এক পাশের দিকে একটা যুবক একা একা বসে আছে। পানি ছুঁয়ে আসা শীতল বাতাস গায়ে লাগছে। লেকের পানিতে গাছের ছায়া পড়ে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। কি দারূণ মিতালি । লেকটার অপর প্রান্তে কয়েকটা গাছে হলুদ রঙের ফুলগুলো ঝুলে আছে। ওই হলুদ রঙের ফুলগুলোকে কেন্দ্র করে মৌমাছি ভ্রমর রেণু সংগ্রহে ব্যাস্ত, মৌমাছি ওই ফুল থেকে মধু তৈরি করে কিন্তু ভ্রমর ওই ফুলের রস সংগহ করে তৈরি করে বিষ। এই ভূমিকাটি ফুলের নয়, যে গ্রহণ করছে তার। ঘটনাটা অনেকাংশে মিল আছে মানুষের সাথে। পড়াশুনা করে ডিগ্রী অর্জন করলেই মানুষ স্বশিক্ষিত হয় না। এই ভূমিকাটিও শিক্ষার নয়, শিক্ষা যে গ্রহণ করছে তার। আমাদের সমাজে কিছু শিক্ষিত মানুষ আছে, যারা শিক্ষিত হয়েও সমাজের জন্য মধু তৈরি না করে বিষ তৈরি করে।

আমাদের পাশে একটু দূরে বসে থাকা ছেলেটা এখনো একমনে নিশ্চুপ। ওর দিকে তাকিয়ে কথা বলতে ইচ্ছা হলো, কাছে গিয়ে শুধালাম, কি নাম তোমার ভাই? অবাক চোখে তাকিয়ে সহসা উত্তর দেয়, "ইউসুফ"। তুমি কি কারো জন্য অপেক্ষা করছো? না খুব খারাপ লাগছিলো, তাই একা একা বসে আছি। কি আশ্চার্য! মনে মনে ভাবি, মন খারাপের মানুষগুলোই কি শ্বাস ফেলার জন্য একটু মুক্ত পরিবেশ চায়! তারপর ইউসুফের সাথে একটা দুটো করে কথা শুরু হয়ে গেলো, অনেক কথা। ইউসুফ একটা গার্মেন্টসে চাকুরি করে। সকাল ৮টায় ফ্যাক্টোরিতে ঢোকে, রাত ৮টায় বের হয়। মাসে দশ হাজার টাকা বেতন পায়,

একটা মেসে থাকে, সেখানে তার খরচ হয় তিন হাজার টাকা। এই ঢাকা শহরে তিন হাজার টাকায় থাকা খাওয়া কেমন পরিবেশে হবে তা বোঝার আর বাকি থাকে না। ইউসুফের বাড়িতে অসুস্থ বাবা, মা আর ছোট্ট একটা বোন আছে, নাম তিথি দশম শ্রেণীতে পড়ে। ইউসুফ প্রতি মাসে বাড়িতে ছয় হাজার টাকা পাঠায়। অসুস্থ বাবার ঔষধ, সংসারের খরচ, বোনের পড়াশুনার খরচ সব ইউসুফের পাঠানো ছয় হাজার টাকার উপর নির্ভর। এই পরিবারের একমাত্র অর্থ উপার্জন ইউসুফ ছাড়া কেউ নেই। ইউসুফের পাঠানো ছয় হাজারে সংসার চালানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে তার মায়ের। ইউসুফের মা প্রতিমাসে খরচের হিসাব দেয়, যা তার পাঠানো টাকা দিয়ে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। ইউসুফের কথা শুনতে শুনতে আমি কোথায় যেনো হারিয়ে গেছি। এভাবে কথা বলতে বলতে আকাশ লাল হয়ে এসেছে, দিনের আলো হেলে পড়ছে সন্ধ্যার কোলে। কাকেরা কা কা করে ফিরছে নীড়ে ।

ইউসুফ বলে যাচ্ছে অনর্গল, কাল রাতে যখন মায়ের সাথে মোবাইলে কথা হচ্ছিলো পাশে থেকে বাবার চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম। মাকে বলছিলো, তোর পোলারে ক টাকা পাঠাতে। কি করে সে ঢাকা শহরে, সবাই কতো টাকা পাঠায়, আর তোর পোলা ছয় হাজারের বেশি পাঠাতে পারে না কেন? ইউসুফের চোখ ভরে গেছে জলে, সহসা বলছে, ভাইয়া জানেন, আমি কোন বাজে খরচ করি না। এমনকি ফ্যাক্টরিতে যখন দুপুরে খাবার বিরতি হয় সবাই খেতে যায়, অনেকে ডাকে একসাথে খাবে বলে। কিন্তু আমি একটু দেরিতে যাই। সবাই রোজ আলাদা আলাদা খাবার নিয়ে আসে। আমার বেশিরভাগ সময় আলু ভর্তা ডাল, তাই আলাদা হয়ে, নয়তো দেরি করে খেয়ে নেই। আমারও তো একটু ভালো খাবার খেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু আমি না খেয়ে কিছু টাকা বাঁচাই বাড়িতে পাঠাবো বলে। প্রতিদিন হেঁটে যাতায়াত করি, ঠিকমতো নিজের পরার কাপড়ও কিনি না। সাতজনে ঠাসাঠাসি করে একটা রুমে থাকি। জানেন ভাইয়া, আমার পরিবারকে কষ্টে রেখে আমি যে ভালো নেই এটা কাউকে বোঝাতে পারি না। ইউসুফের সাথে কথা বলতে বলতে আমার কষ্টগুলো কোথায় যেনো হারিয়ে গেছে। একটা সমুদ্রের কাছে ছোট নদী যেমন তুচ্ছ, তেমন তুচ্ছ মনে হচ্ছে নিজের খারাপ লাগাগুলোকে। কথা বলতে বলতে ইফসুফের চোখ টলমল। অধিক মেঘে বৃষ্টি না হলে আকাশের বোধহয় এমনি কষ্ট হয়। মনের কথাগুলো জমাতে জমাতে ইউসুফ বড্ড ক্লান্ত এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ইউসুফের এই কথাগুলো শোনার কোন মানুষ নেই, বলার মতো ইউসুফও কোন মানুষ খুঁজে পায় না। কথা শেষে বেশ হালকা মনে হচ্ছিলো, একা বসে থাকার মতো নীরবতা নেই আর ইউসুফের।

ওই যে লেকের পাশে হলুদ ফুলগুলো দেখছো ইউসুফ! একটু আগে ওখানে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করছিলো। এক ফোঁটা মধু সংগ্রহ করার জন্য অনেকগুলো ফুলে যেতে হয়, অনেক গুলো ফুলে যেতে মৌমাছির অনেক কষ্ট করতে হয়। তারপর সে এক ফোঁটা বিশুদ্ধ সুস্বাদু মধু তৈরি করতে সক্ষম হয়। যে যত কষ্ট করবে, তার ফলাফল তত শ্রেষ্ঠ সুন্দর হবে। মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনশীল। তার একমাত্র ক্ষমতা স্রষ্টার হাতে। তুমি তোমার মতো চেষ্টা করো, একদিন তোমার জীবনে ঠিকই আলো অসবে। কথা বলতে বলতে আধারে গিলে ফেলেছে দিনের আলো। জ্বলে উঠেছে চারদিকে ঝলমলে রঙিন বাতিগুলো। লেকের পাড় ঘেসে পিচঢালা কালো রাস্তাটায় জ্যামে আটকে আছে গাড়িগুলো, সিগন্যাল ছেড়ে দিলে গন্তব্যে ফেরার জন্য গাড়িগুলো আবার ছুটতে থাকে রুদ্ধশ্বাসে। আমরাও আসন ছেড়ে উঠে পড়ি, ইউসুফ চলে যায় ইফসুফের গন্তব্যে। এভাবেই এই শহরের কষ্টগুলো দীর্ঘশ্বাস হয়ে রাত পেরিয়ে সকাল হয়, দুপুর হয়, সন্ধ্যা হয়ে আবার নেমে আসে রাত।

জীবনের গল্প

সবুজ খান
৪২তম ব্যাচ, বিবিএ
আই.ডিঃ ১৬২০২০১০১০১৩

এইতো কিছুদিন পূর্বেই শেষ হয়েছিলো সবুজের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সবুজের বন্ধুমহলের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছিলো, অন্য সবার মত সবুজও প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলো। সাধারণত সবুজদের এলাকার শিক্ষার্থীরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে কিছু দিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে থাকে। যথাযথভাবে সবুজদের ব্যাচের মোটামুটি সবাই ভর্তি যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করেছিলো। এইভাবে শেষ হয়ে যেতে লাগলো প্রায় ২ মাস সময়, এইতো আর কিছুদিনের মধ্যে বের হবে সবুজদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। সবাই মোটামুটি চিন্তিত, চিন্তা করাটাই তখন স্বাভাবিক। প্রত্যেকের ভেতরে কেমন একটা ভীতি কাজ করেছে, তবুও সকলেই সেই ভীতি নিয়ে নিজেদের প্রস্তুতির কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। আর দশ জনের মতই সবুজেরও একই অবস্থা। ৭ই আগস্ট সবুজদের ফলাফলের দিন, অনেকের স্বপ্ন পুরণ হয়েছে, অনেকের আবার স্বপ্ন পুরণ হয়নি। দুর্ভাগ্যবশত সবুজের মনের আশা বা স্বপ্ন পূরণ হয়নি সেদিন, পাড়ার অন্য সব শিক্ষার্থীর মত ছিলো না সবুজ। তাই হয়ত পাড়া মহল্লার সবাই এবং সবুজের শিক্ষকও সবুজের পরীক্ষার ফলাফলটা মেনে নিতে পারছিলো না। পরীক্ষার ফলাফলের কারণে সবুজ মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছিলো তখন। যেটার ফলশ্রুতিতে সবুজের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির প্রস্তুতি খারাপ হতে হয়েছিল। তবুও নিজেকে অনেক বুঝিয়ে নিজের ভর্তির যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকলো। শুরু হয়ে গিয়েছিলো অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার কার্যক্রম। অন্য সবার মত সবুজও অংশগ্রহণ করছিলো অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু ভাগ্যের কি ফের, কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়নি ছেলেটার, অপেক্ষমান ছিলো ৩টা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু সেগুলোতেও একই অবস্থা হয়েছিলো। ঐ মুহূর্তে সবুজ নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি যুদ্ধের পরাজিত সৈনিক ভেবেছিলো। সবুজ ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ছিলো, যার ফলে এলাকার একটা স্বনামধন্য কলেজে হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হয়। বন্ধুমহলের প্রত্যেকে দেশের বড় বড় স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এলাকাতে সবুজ একাই ছিলো যার সেবার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ হয়নি। প্রায় সবাই চলে গিয়েছিলো নিজেদের স্বপ্নের ঠিকানায়, যে স্বপ্নটা দেখে সবুজের গ্রামের প্রতিটা শিক্ষার্থী। সবুজ যেন মানতেই পারছিলো না, তাইতো খুব কষ্ট পেয়েছিল সবুজ, খুব মন খারাপ করে থাকতো। এইভাবে বেশ কিছুদিন বিপর্যস্ত মন নিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে থাকে সবুজ, কিছুদিন চলার পর হঠাৎ করে সবুজের জীবনে একটা ঝড় বয়ে গেলো।

সবুজ মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে, এরপর প্রায় আঠারো মাস ঘরমুখী ছিলো সবুজ। তারপর খুব একাকি জীবন যাপন করেছিলো ছেলেটা। নিজেকে আড়াল করেছিলো অন্যদের থেকে। এর মাঝে হঠাৎ একদিন সবুজের এক শুভাকাংক্ষী সবুজের সব তথ্য নেয় সবুজের পরিবার থেকে এবং এরপর থেকে তিনিই সবুজের পাশে দাঁড়ানের চেষ্টা করে। তিনি সবুজদের

সম্পর্কে সব কিছু অবগত ছিলেন। তিনি প্রতিদিনই সবুজকে অনেক বোঝাতেন এবং এইভাবে সবুজকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করতে থাকেন। সবুজ অনেকটাই স্বাভাবিক রূপে ফিরেছে, আবারও নতুন করে স্বপ্ন বুনতে শুরু করেছে। যে ব্যক্তি সবুজকে নতুন স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করেছে, তিনি হঠাৎ সবুজকে বলছে তোমার না একজন মামা ছিলো, তিনি শুনেছিলাম ঢাকার একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা বোর্ডের সাথে জড়িত ছিলো, তোমার ঐ মামার সাথে এখন কোনো যোগাযোগ আছে? উত্তরে সবুজ বললো, না, যোগাযোগ নাই, তবে ফোন নাম্বার আছে। কিন্তু হঠাৎ করে মামার কথা কেনো বলছেন ? উত্তরে ঔ ব্যক্তি বললো, তুমি তোমার জীবনটা নতুন করে শুরু করবে, তুমি তোমার ওই মামার কাছে যাও এবং তোমার কথাগুলো বলবে এবং লেখাপড়া করতে চাও সেটাও বলবে। ঐ মামা সবুজের আপন মামা ছিলেন না, তবে আপনের থেকেও যদি আপন মামা থেকে থাকেন তাহলে সবুজের সেটা ছিলেন তিনি। খুব ছোট বেলা থেকে সবুজকে মামা খুব ভালোবাসতেন। সবুজ ওর মামাকে ছোটবেলা থেকে নিজের স্বপ্নদ্রষ্টা ভাবতেন। বড় হয়ে মামার মতো মানুষ হবে সেই স্বপ্ন দেখতো। সবুজের মামা শুধু সবুজের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন না, তিনি ছিলেন হাজারো মানুষের স্বপ্নদ্রষ্টা। তাইতো সবুজ তার শুভাকাংক্ষীর কথা মতো 'মা' কে নিয়ে ঢাকাতে মামার কাছে ছুটে আসে। মামা প্রথমত একটু রাগ করে বসে সবুজের উপর, কিন্তু সে রাগটা ছিলো শুধু অভিমান। মামার অবাধ্য হওয়ার রাগ। যে ছেলেটাকে ছোট বেলা থেকে আদর ভালোবাসা দিয়েছেন তাকে তো হুট করে ফেলা যায় না, তাই মামা সবুজকে ভর্তি হওয়ার কথায় সম্মতি দিলেন। সবুজের মামা একজন মানুষ না, মহামানুষ বললে হয়তো ভুল করবে না সবুজ। যাই হোক তারপর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে সবুজ।

সবুজ এখন ছুটে চলেছে নিজের স্বপ্নের পিছে অবিরাম, সে এখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের স্নাতক শ্রেণীর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। এটাই শাহ্ রাফিন আহম্মেদ সবুজের ঝিনাইদহ থেকে ঢাকাতে আসার গল্প।

কবিতা (ফিরে দেখা)

কাজী নজরুল ইসলাম : মোহর্‌রম
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : দূরের পাল্লা
সুকুমার রায় : জীবনের হিসাব
সুনির্মল বসু : সবার আমি ছাত্র
শামসুর রাহমান : অভিশাপ দিচ্ছি
সুকান্ত ভট্টাচার্য : ছাড়পত্র
সুভাষ মুখোপাধ্যায় : ফুল ফুটুক না ফুটুক
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি
হোসনে আরা : সফদার ডাক্তার
হুমায়ুন আজাদ : আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর জন্যে

মোহর্‌রম

কাজী নজরুল ইসলাম

নীল সিয়া আস্‌মান, লালে লাল দুনিয়া
"আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।"
কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে!
রুদ্র মাতম ওঠে দুনিয়া-দামেশ্‌কে–
"জয়নালে পরালো এ খুনিয়ারা বেশ কে?"
'হায় হায় হোসেনা', ওঠে রোল ঝঞ্ঝায়,
তল্‌ওয়ার কেঁপে ওঠে এজিদেরো পাঞ্জায়,
উন্মাদ দুলদুল্ ছুটে ফেরে মদিনায়,
আলী-জাদা হোসেনের দেখা হোথা যদি পায়!
মা ফাতেমা আস্‌মানে কাঁদে খুলি' কেশপাশ,
বেটাদের লাশ নিয়ে বধূদের শ্বেত বাস!
রণে যায় কাসিম ঐ দু'ঘড়ির নওশা,
মেহেদীর রঙটুকু মুছে গেল সহসা!
'হায় হায়' কাঁদে বায় পূরবী ও দখিনা–
'কঙ্কন পঁইচি খুলে ফেল সকীনা!'
কাঁদে কে রে কোলে ক'রে কাসিমের কাটা-শির?
খান্ খান্ খুন হ'য়ে ক্ষরে বুক–ফাটা নীর!
কেঁদে গেছে থামি' হেথা মৃত্যুও রুদ্র,
বিশ্বের ব্যথা যেন বালিকা এ ক্ষুদ্র!
গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে কচি মেয়ে ফাতিমা,
"আম্মা গো পানি দাও ফেটে গেল ছাতি মা!"
নিয়ে তৃষা শাহারার দুনিয়ার হাহাকার,
কারবালা-প্রান্তরে কাঁদে বাছা আহা কার!
দুই হাত কাটা তবু শের-নর আব্বাস্!

পানি আনে মুখে, হাঁকে দুশ্‌মনও 'সাব্বাস্‌'!
দ্রিম্‌ দ্রিম্‌ বাজে ঘন দুন্দুভি দামামা,
হাঁকে বীর "শির দেগা, নেহি দেগা আমামা।"
কলিজা কাবাব-সম ভুনে মরু-রোদ্দুরে,
খাঁ খাঁ করে কারবালা, নাই পানি খর্জুরে,
মা'র স্তনে দুধ নাই, বাচ্চারা তড়পায়,
জিভ চুষে' কচি জান থাকে কিরে ধড়টায়?
দাউ দাউ জ্বলে শিরে কারবালা ভাস্কর,
কাঁদে বানু–"পানি দাও, মরে জাদু আস্‌গর!"
পেলো না তো পানি শিশু পিয়ে গেল কাঁচা খুন,
ডাকে মাতা পানি দেবো ফিরে আয় বাছা শুন!
পুত্রহীনার আর বিধবার কাঁদনে
ছিঁড়ে আনে মর্মের বত্রিশ বাঁধনে
তাম্বুতে শয্যায় কাঁদে একা জয়নাল,
"দাদা! তেরি ঘর কিয়া বরবাদ পয়মাল!
হাইদরী-হাঁক হাঁকি, দুল্‌দুল্‌-আস্‌ওয়ার
শম্‌শের চমকায় দুশমনে ত্রাসবার।
খ'সে পড়ে হাত হ'তে শত্রুর তরবার,
ভাসে চোখে কিয়ামতে আল্লার দরবার।
নিঃশেষ দুশমন; ও কে রণ-শ্রান্ত
ফোরাতের নীরে নেমে মুছে আঁখি-প্রান্ত?
কোথা বাবা আস্‌গর? শোকে বুক ঝাঁঝরা
পানি দেখে হোসেনের ফেটে যায় পাঁজরা!
ধুঁকে ম'লো আহা তবু পানি এক কাৎরা
দেয়নি রে বাছাদের মুখে কম্‌জাতরা!
অঞ্জলি হ'তে পনি প'ড়ে গেল ঝর্‌ ঝর্‌,
লুটে ভূমে মহাবাহু খঞ্জর-জর্জর!
হল্‌কুমে হানে তেগ ও কে ব'সে ছাতিতে? –
আফতাব ছেয়ে নিল আঁধারিয়া রাতিতে!
আসমান ভ'রে গেল গোধূলিতে দুপুরে,
লাল নীল খুন ঝরে কুফরের উপরে!
বেটাদের লোহু-রাঙা পিরহান হাতে, আহ্‌ –
'আরশের' পায়া ধ'রে কাঁদে মাতা ফাতেমা,

"এয় খোদা বদ্‌লাতে বেটাদের রক্তের
মার্জনা করো গোনা, পাপী কম্‌বখতের।"
কত মোহর্‌রম এলো, গেল চ'লে বহু কাল –
ভুলিনি গো আজো সেই শহীদের লোহু লাল।
মুসলিম! তোরা আজ 'জয়নাল আবেদীন',
'ওয়া হোসেনা–ওয়া হোসেনা' কেঁদে তাই যাবে দিন!
ফিরে এলো আজ সেই মোহর্‌রম মাহিনা,–
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া-ক্রন্দন চাহি না।
উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ্ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুস্‌লিম কারো শির,–
তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা,
শম্‌শের হাতে নাও বাঁধো শিরে আমামা!
বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য,
হুঁশিয়ার ইসলাম, ডুবে তব সূর্য!
জাগো, ওঠো মুসলিম, হাঁকো হাইদরী হাঁক।
শহীদের দিনে সব লালে–লাল হ'য়ে যাক্!
নওশার সাজ নাও খুন-খচা আস্তীন,
ময়দানে লুটাতে রে লাশ এই খাস দিন!
হাসানের মতো পিব পিয়ালা সে জহরের,
হোসেনের মতো নিব বুকে ছুরি কহরের;
আস্‌গর সম দিব বাচ্চারে কোরবান,
জালিমের দাদ নেবো, দেবো আজ গোর জান!
সকীনার শ্বেত বাস দেবো মাতা কন্যায়,
কাসিমের মতো দেবো জান রুধি' অন্যায়।
মোহর্‌রম! কারবালা! কাঁদে "হায় হোসেনা!"
দেখো মরু-সূর্যে এ খুন যেন শোষে না!

দূরের পাল্লা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ছিপ্‌খান্ তিন্-দাঁড়-
তিনজন্ মাল্লা
চৌপর দিন-ভর
দ্যায় দূর পাল্লা।
পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল,– জঞ্জাল
জলময় শৈবাল
পান্নার টাকশাল।
কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ চর জাগ্‌ছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাক্‌ছে।
চুপ চুপ – ওই ডুব
দ্যায় পান্‌কৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোম্‌টার বউটি।
ঝক্‌ঝক্ কলসীর
বক্‌বক্ শোন্ গো,
ঘোমটায় ফাঁক রয়
মন উন্মন্ গো।
তিন দাঁড় ছিপখান্
মন্থর যাচ্ছে,
তিন জন মাল্লায়
কোন্ গান গাচ্ছে?
রূপশালি ধান বুঝি
এই দেশে সৃষ্টি,
ধুপছায়া যার শাড়ি
তার হাসি মিষ্টি।
মুখখানি মিষ্টি রে
চোখদুটি ভোম্‌রা
ভাব-কদমের – ভরা
রূপ দ্যাখো তোমরা।

জীবনের হিসাব

সুকুমার রায়

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি সখের বোটে
মাঝিরে কন, 'বলতে পারিস্, সূর্যি কেন ওঠে?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে? জোয়ার কেন আসে?
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যালফেলিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, 'সারা জনম মরলিরে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি!"

খানিক বাদে কহেন বাবু, 'বলত দেখি ভেবে
নদীর ধারা কেম্‌নে আসে পাহাড় হতে নেবে?
বল্‌ত কেন লবণপোরা সাগর ভরা পানি?'
মাঝি সে কয়, 'আরে মশাই অত কি আর জানি?'
বাবু বলেন, 'এই বয়সে জানিস্‌নেও তাকি?
জীবনটা তোর নেহাৎ খেলো, অষ্ট আনাই ফাঁকি।'

আবার ভেবে কহেন বাবু, 'বল্‌ত ওরে বুড়ো,
কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ঐ চূড়ো?
বল্‌ত দেখি সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন?'
বৃদ্ধ বলে, 'আমায় কেন লজ্জা দেছেন হেন?'
বাবু বলেন, 'বল্‌ব কি আর বল্‌ব তোরে কি তা,–
দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা।'

খানিক বাদে ঝড় উঠেছে ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন নৌকোখানি ডুব্‌ল বুঝি দুলে।
মাঝিরে কন, 'একি আপদ! ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুবল নাকি নৌকা এবার? মর্‌ব নাকি আজি?
মাঝি শুধায়, 'সাঁতার জানো?' মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, 'মশাই এখন কেন বাবু?
বাঁচ্‌লে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।'

সবার আমি ছাত্র

সুনির্মল বসু

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাই রে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাই রে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান–
হই যেন ভাই মৌন-মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে–
দিন-খোলা হই তাই রে।
সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়
আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখাল হাসতে মোরে,
মধুর কথা বলতে।
ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর –
অন্তর হোক রত্ন-আকর;
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম
আপন বেগে চলতে।
মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হতে
পাষাণ দিল দীক্ষা।
ঝরর্ণা তাহার সহজ গানে,
গান জাগাল আমার প্রাণে;
শ্যাম বনানী সরসতা
আমায় দিল ভিক্ষা।
বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র,
নানান ভাবে নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়,
পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়
শিখছি সে সব কৌতূহলে,
নেই দ্বিধা লেশমাত্র।

অভিশাপ দিচ্ছি

শামসুর রাহমান

না, আমি আসি নি
ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রাচীন পাতা ফুঁড়ে,
দুর্বাশাও নই,
তবু আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত-গোধূলিতে
অভিশাপ দিচ্ছি।
আমাদের বুকের ভেতর যারা ভয়ানক কৃষ্ণপক্ষ দিয়েছিল সেঁটে,
মগজের কোষে কোষে যারা
পুঁতেছিল আমাদেরই আপনজনের লাশ
দগ্ধ, রক্তাপ্লুত,
যারা গণহত্যা করেছে
শহরে গ্রামে টিলায় নদীতে ক্ষেত ও খামারে,
আমি অভিশাপ দিচ্ছি
নেকড়ের চেয়েও অধিক পশু
সেই সব পশুদের।
ফায়ারিং স্কোয়াডে ওদের সারিবদ্ধ দাঁড় করিয়ে
নিমেষে ঝাঁ ঝাঁ বুলেটের বৃষ্টি
ঝরালেই সব চুকেবুকে যাবে তা আমি মানি না।
হত্যাকে উৎসব ভেবে যারা পার্কে মাঠে ক্যাম্পাসে বাজারে
বিষাক্ত গ্যাসের মতো মৃত্যুর বীভৎস গন্ধ দিয়েছে ছড়িয়ে,
আমি তো তাদের জন্যে অমন সহজ মৃত্যু করি না কামনা।
আমাকে করেছে বাধ্য যারা
আমার জনক-জননীর রক্তে পা ডুবিয়ে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে যেতে
আসতে নদীতে আর বনবাদাড়ে শয্যা পেতে নিতে,
অভিশাপ দিচ্ছি আজ সেই খানে-দজ্জালদের।
অভিশাপ দিচ্ছি ওরা চিরদিন বিশীর্ণ গলায়
নিয়ত বেড়াক বয়ে গলিত নাছোড় মৃতদেহ,
অভিশাপ দিচ্ছি
প্রত্যহ দিনের শেষে ভরা
হাঁটু মুড়ে এক টুকরো শুকনো রুটি চাইবে ব্যাকুল,
কিন্তু রুটি প্রসারিত থাবা থেকে রইবে
দশ হাত দূরে সর্বদাই।

অভিশাপ দিচ্ছি
ওদের তৃষ্ণায় পানপাত্র প্রতিবার
কানায় কানায় রক্তে উঠবে ভরে, যে রক্ত বাংলায়
বইয়ে দিয়েছে ওরা হিংস্র
জোয়ারের মতো
অভিশাপ দিচ্ছি
আকণ্ঠ বিষ্ঠায় ডুবে ওরা অধীর চাইবে ত্রাণ
অথচ ওদের দিকে কেউ
দেবে না কখনো ছুঁড়ে একখণ্ড দড়ি।
অভিশাপ দিচ্ছি
স্নেহের কাঙাল হয়ে ওরা
ঘুরবে ক্ষ্যাপার মতো এপাড়া ওপাড়া,
নিজেরই সন্তান
প্রখর ফিরিয়ে নেবে মুখ,
পারবে না চিনতে কখনও;
অভিশাপ দিচ্ছি এতটুকু আশ্রয়ের জন্যে,
বিশ্রামের কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে
দ্বারে দ্বারে ঘুরবে ওরা। প্রেতায়িত
সেইসব মুখের ওপর দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে পৃথিবীর প্রতিটি কপাট,
অভিশাপ দিচ্ছি,
অভিশাপ দিচ্ছি,
অভিশাপ দিচ্ছি...

ছাড়পত্র

সুকান্ত ভট্টাচার্য

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম;
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চীৎকারে।
খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত
উত্তোলিত, উদ্ভাসিত
কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।
সে ভাষা বুঝে না কেউ,
কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার।
আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা
পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের-
পরিচয়-পত্র পড়ি ভূমিষ্ট শিশুর
অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে।
এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব–তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপনে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি–
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার
অবশেষে সব কাজ সেরে,
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাবে আশীর্বাদ,

তারপর হব ইতিহাস।

ফুল ফুটুক না ফুটুক

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।
শান-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।
ফুল ফুটুক আর না ফুটুক
আজ বসন্ত।
আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপর খুলে-
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে-
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে-
গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে
একটা দুটো পয়সা পেলে
যে হরবোলা ছেলেটা
কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত
—তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো।
লাল কালিতে ছাপা হল্‌দে চিঠির মতো
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধ'রে
এইসব সাত-পাঁচ ভাবছিল—
ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ। পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!
তারপর দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।
অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়িপাকানো সেই গাছ
তখনও হাসছে।

আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ
এই কি মানুষজন্ম? নাকি শেষ
পরোহিত-কঙ্কালের পাশা খেলা ! প্রতি সন্ধেবেলা
আমার বুকের মধ্যে হাওয়া ঘুরে ওঠে, হৃদয়কে অবহেলা
করে রক্ত: আমি মানুষের পায়ের কাছে কুকুর হয়ে বসে
থাকি–তার ভেতরের কুকুরটাকে দেখবো বলে। আমি আক্রোশে
হেসে উঠি না, আমি ছারপোকার পাশে ছারপোকা হয়ে হাঁটি,
মশা হয়ে উড়ি একদল মশার সঙ্গে; খাঁটি
অন্ধকারে স্ত্রীলোকের খুব মধ্যে ডুব দিয়ে দেখেছি দেশলাই জ্বেলে-
(ও-গাঁয়ে আমার কোনো ঘরবাড়ি নেই)!–
আমি স্বপ্নের মধ্যে বাবুদের বাড়ির ছেলে
সেজে গেছি রঙ্গালয়ে, পরাগের মতো ফুঁ দিয়ে উড়িয়েছি দৃশ্যালোক
ঘামে ছিল না এমন গন্ধক
যাতে ক্রোধে জ্বলে উঠতে পারি। নিখিলেশ, তুই একে
কী বলবি? আমি শোবার ঘরে নিজের দুই হাত পেরেকে
বিঁধে দেখতে চেয়েছিলাম যীশুর কষ্ট খুব বেশি ছিল কি না;
আমি ফুলের পাশে ফুল হয়ে ফুটে দেখেছি, তাকে ভালোবাসতে পারি না।
আমি কপাল থেকে ঘামের মতন মুছে নিয়েছি পিতামহের নাম,
আমি শ্মশানে গিয়ে মরে যাবার বদলে, মাইরি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।
নিখিলেশ, আমি এই-রকমভাবে বেঁচে আছি, তোর সঙ্গে
জীবন বদল করে কোনো লাভ হলো না আমার–একি নদীর তরঙ্গে
ছেলেবেলার মতো ডুব সাঁতার?–অথবা চশমা বদলের মতো
কয়েক মিনিট আলোড়ন? অথবা গভীর রাত্রে সঙ্গমরত
দম্পতির পাশে শুয়ে পুনরায় জন্ম ভিক্ষা? কেননা সময় নেই,
আমার ঘরের
দেয়ালের চুন-ভাঙা দাগটিও বড় প্রিয়। মৃত গাছটির পাশে উত্তরের

হাওয়ার কিছুটা মায়া লেগে আছে। ভুল নাম, ভুল স্বপ্ন থেকে বাইরে এসে
দেখি উইপোকায় খেয়ে গেছে চিঠির বান্ডিল, তবুও অক্লেশে
হলুদকে হলুদ বলে ডাকতে পারি। আমি সর্বস্ব বন্ধক দিয়ে একবার
একটি মুহূর্ত চেয়েছিলাম, একটি... ব্যক্তিগত জিরো আওয়ার:
ইচ্ছে ছিলা না জানাবার
এই বিশেষ কথাটা তোকে। তবু ক্রমশই বেশি করে আসে শীত, রাত্রে
এ-রকম জলতেষ্টা আর কখনও পেতো না, রোজ অন্ধকার হাতড়ে
টের পাই তিনটে ইঁদুর। ইঁদুর না মুষিক? তা হলে কি প্রতীক্ষায়
আছে অদূরের সংস্কৃত শ্লোক? পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর এই অবলোয়
কিছুই মনে পড়ে না। আমার পূজা ও নারী-হত্যার ভিতরে
বেজে ওঠে সাইরেন। নিজের দু'হাত যখন নিজেদের ইচ্ছে মতো কাজ করে
তখন মনে হয় ওরা সত্যিকারের। আজকাল আমার
নিজের চোখ দুটোও মনে হয় এক পলক সত্যি চোখ। এরকম সত্য
পৃথিবীতে খুব বেশি নেই আর।

সফদার ডাক্তার

হোসনে আরা

সফদার ডাক্তার মাথা ভরা টাক তার
খিদে পেলে পানি খায় চিবিয়ে,
চেয়ারেতে রাতদিন বসে গোনে দুই-তিন
পড়ে বই আলোটারে নিবিয়ে।
ইয়া বড় গোঁফ তার, নাই যার জুড়িদার
শুলে তার ভুঁড়ি ঠেকে আকাশে,
নুন দিয়ে খায় পান, সারাক্ষণ গায় গান
বুদ্ধিতে অতি বড় পাকা সে।
রোগী এলে ঘরে তার, খুশিতে সে চারবার
কষে দেয় ডন আর কুস্তি,
তারপর রোগীটারে গোটা দুই চাঁটি মারে
যেন তার সাথে কত দুস্তি।
ম্যালেরিয়া হলে কারো নাহি আর নিস্তার
ধরে তারে কেঁচো দেয় গিলিয়ে,
আমাশয় হলে পরে দুই হাতে কান ধরে
পেটটারে ঠিক করে কিলিয়ে।
কলেরার রোগী এলে, দুপুরের রোদে ফেলে
দেয় তারে কুইনিন খাইয়ে,
তারপর দুই টিন পচা জলে তারপিন
ঢেলে তারে দেয় শুধু নাইয়ে।
ডাক্তার সফদার, নাম ডাক খুব তার
নামে গাঁও থরহরি কম্প,
নাম শুনে রোগী সব করে জোর কলরব
পিঠদান দিয়ে দেয় লম্ফ।

একদিন সক্কালে ঘটল কী জঞ্জাল
ডাক্তার ধরে এসে পুলিশে,
হাত-কড়া দিয়ে হাতে নিয়ে যায় থানাতে
তারিখটা আষাঢ়ের উনিশে।

আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর জন্যে

হুমায়ুন আজাদ

আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর জন্যে মারা যাবো
ছোট্ট ঘাসফুলের জন্যে
একটি টলোমলো শিশিরবিন্দুর জন্যে
আমি হয়তো মারা যাবো চৈত্রের বাতাসে
উড়ে যাওয়া একটি পাপড়ির জন্যে
এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্যে

আমি সম্ভবত খুব ছোট্টকিছুর জন্যে মারা যাবো
দোয়েলের শিসের জন্যে
শিশুর গালের একটি টোলের জন্যে
আমি হয়তো মারা যাবো কারো চোখের মণিতে
গেঁথে থাকা একবিন্দু অশ্রুর জন্যে
একফোঁটা রৌদ্রের জন্যে

আমি সম্ভবত খুব ছোট্টকিছুর জন্যে মারা যাবো
এককণা জ্যোৎস্নার জন্যে
এক টুকরো মেঘের জন্যে
আমি হয়তো মারা যাব টাওয়ারের একুশ তলায়
হারিয়ে যাওয়া একটি প্রজাপতির জন্যে
একফোঁটা সবুজের জন্যে

আমি সম্ভবত খুব ছোট্টকিছুর জন্যে মারা যাবো
খুব ছোটো একটি স্বপ্নের জন্যে
খুব ছোটো দুঃখের জন্যে
আমি হয়তো মারা যাবো কারো ঘুমের ভেতরে
একটি ছোটো দীর্ঘশ্বাসের জন্যে
একফোঁটা সৌন্দর্যের জন্যে।

কবিতা

নির্মলেন্দু গুণ : কাব্য সুন্দরী
মহাদেব সাহা : কাব্যের ভবিষ্যৎ
রবিউল হুসাইন : উনভাব অপরাধ
আবিদ আনোয়ার : সহজ সুন্দরী
হাবীবুল্লাহ সিরাজী : জট তবু গিট
মারজুক রাসেল : চাবুকের নৌকা
মুজিব ইরম : অনুরাগ
মুহাম্মদ নূরুল হুদা : সার্বভৌম খামার
নাসির আহমেদ : একটি চিত্রকর্মের জন্য
মীর শাহাবুদ্দিন : আমার দেশ বাংলাদেশ
সৈয়দ শফিউল ইসলাম : পান্থশালা
মোঃ ওয়াহিদুর রহমান : সজাগ হয়ে যাও
প্রফেসর ড. আবদুর রহমান : বিপন্ন মানবতা
Professor Mahboob Ul Alam : Trees Turn Trimming
মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন খান : খোকা থেকে জাতির জনক
ড. আবু তাহের : বিজয় তুমি
মোঃ জসীম উদ্দীন সীমান্ত : শেষ ভাবনা
স্বরূপ রায় : আমি আমার হতে চাই
মোঃ শামীমুর ইসলাম : স্বপ্নময় প্রাইম ইউনিভার্সিটি
সাব্বির আহমেদ : বাস্তব জীবন
হাসান মোহাম্মদ শরিফুল হক : তুরাগ নদী
মোঃ শামসুল আকরাম : স্বার্থপর
Md Farhan Abid Eham : Unpaid Intern
রাজু আহমেদ : সংগ্রাম
হাফিজুর রহমান : মনোবল
কাজি মাহামুদুল হাসান : নির্মমতা
মোঃ আতাউর রহমান তুরাক : আমার মা
মোঃ আব্দুল মোহাইমিন : বসন্তের রঙ ঢং
ফারহানা জেবিন রিতু : অন্তর্জাল
আশরাফ মন্ডল : আমার চাঁদ
মিফ্‌তাহুল জান্নাত মিষ্টি : মা

কাব্য সুন্দরী

নির্মলেন্দু গুণ

যতোই ফেরাতে চাই চোখ,
সুন্দরের টানে
ততোই সে ফিরে যায়-
কেন্দ্রস্রোতে
পুনরায় তারই মুখপানে।

যতোই চোখকে বলি-
ঐ মুখপানে আর চেয়ো না,
যতোই মনকে বলি-না,
ঐ মায়া-হরিণীর পিছে
তুমি আর মিছে ধেয়ো না।

কেউ কি সে কথা শোনে?

সুন্দরের মাতাল নেশায়
হিমালয় থেকে নেমে আসা
নদীজলে সমুদ্র ভেসে যায়।

কল্পনা শুধু কল্পনাজাল বোনে।

কাব্যের ভবিষ্যৎ

মহাদেব সাহা

কাব্যের ভবিষ্যৎ কী, নিশ্চিত জানি না,
যুগের পর যুগ ঘাঁটি কত কাব্য বিবর্ণ ক্লিশে,
মাত্র মলিন পৃষ্ঠা
সৌন্দর্য, শোভা ঝরে গেছে,
তবু কবিতার দৃশ্য আকাশে আজো সমান দীপ্তিমান
বহু উজ্জ্বল নক্ষত্র;
মানুষের ভবিষ্যতের মতোই কাব্যেরও ভবিষ্যৎ কেউ
সঠিক জানে না
থাকবে কি কবিতা? নাকি উড়ে যাবে উত্তাল বাতাসে
কবিতা কাতর হবে গদ্যের গ্রাসে,
বিলীন হবে সে কালস্রোতে, নিশ্চিত জানি না;
তবু এই উদ্বেগের ঝড়ো হাওয়ার মাঝেও বলতে পারি
মানব সভ্যতা যদি থাকে, অবশ্যই থাকবে কবিতা,
অমর নক্ষত্র সব ছড়াবে দৃপ্ত আলো, অনুভূতি
সিক্ত হবে মানুষের, সিক্ত হবে প্রাণ,
মানুষ থাকলে থাকবে কবিতা, কবিতা তার বিশুদ্ধ হৃদয়।

ঊনভাব অপরাধ

রবিউল হুসাইন

চারিদিকে নিরাকার আকারের সার্থকতা
বহুদূরে মানুষের জনপদ দৃশ্যমান
নদীদের জলস্রোতে ভাসমান পাখিকুল
আনমনে ডুবুরির সাবলীল কুশলতা

প্রকৃতির অবদান সবকিছু মনোময়
সেইসব গুদামের ভাণ্ডারের কতকিছু
পেয়েছিল অফুরান কৃতকর্মে বিহ্বল
সারাদিন সারারাত আনন্দ সুধাময়

মাঝামাঝি বিষণ্ন মনোভাব উপভোগ্যে
পূর্ণতার সারাংশে বিধিলিপি নিচুমুখী
এরপর তারপর আগুয়ান যাযাবর
মরুভূমি সান্নিধ্যে নিরাপদ বহুভোগ্যে।

আশালতা অশালীন বহমান সমুদয়
পাহাড়ের পাদদেশে উপত্যকা সবুজাভ
হৃদয়ের ঢেউগুলো নিরুপায় জলাধারে
পাশাপাশি কুমিরেরা সাবলীল কতিপয়

সবকিছু গণ্যমান্য অপমান অশালীন
ঊনভাব অপরাধ মূল্যায়ন অন্তরীণ।

সহজ সুন্দরী

আবিদ আনোয়ার

জেনেছি তোমার দেবী, আছে গুপ্তধন-
কী হবে আবৃত করে অলংকারে-পরিচ্ছদে? থাক:
ক্লাসিক সৌন্দর্যময়ী উন্মোচিত হলে
নগ্নতাকে মনে হয় অনিন্দ্য পোশাক!

ডাস্টবিনে ঢাকনা চাই,
অনাবৃত নর্দমাও জঘন্য অশ্লীল-
জঘন দেখিয়ে ফেরে চপলা হরিণী,
উলঙ্গ আকাশ কত দ্বিধাহীন মেলে ধরে
অবারিত নীল।

পাপড়ি মেলা না-অবধি কারা আর তাকে ডাকে 'ফুল'?
প্রাণান্ত চেষ্টায় শেষে যেমন পরাস্ত হয় বেশরম বৃতি-
প্রস্ফুটিত হয়ে থাকো চর্যাপদ অতিক্রান্ত 'সহজ সুন্দরী';
মনে করো মতান্তরে তুমিও প্রকৃতি!

জট তবু গিঁট

হাবীবুল্লাহ সিরাজী

খুলে ফেলা মানে মুক্ত নয় তো
বিরুদ্ধ ঢাল
শিকড়ে কাণ্ডে পাতার প্রণয়ে
মূলত যে ভাব
চুমুকের শ্বাসে ছোঁয়া চুম্বনে
আঁধারের স্বর
অধীর শরীরে রক্তের তোড়ে
পূর্ণ শিহর
হৃদয়ের ঘোরে গহন পলকে
অলিক জবাব

দু'বাহু বাড়ালে তৃতীয় আড়াল
শরীরে ভুল
বুঝিবা জলের অতল মিলনে
ঘূর্ণি ভঙ্গি
মধু ও শিশিরে মায়াবী ভোজে
তীরের সঙ্গী
আলো ফুরাবার আগে মোচড়
দিগন্তে ঝুল

দরদে পরতে পাক লাগা সুতো
বাড়ালো ভাসান
ধূমকেতু ছোটে উধাও গগনে
শূন্য নেশায়
অন্ধকার তো ধারণা মাত্র
বিয়োগ-দশায়
শেষ হ'লে তিথি অগ্নি-গোলকে
অমৃতপুরাণ

জট তবু গিঁট কাঙালের কাছে
অথৈ পাতাল

চাবুকের নৌকা

মারজুক রাসেল

যে নৌকা দিয়া পিটাইতেছেন সেইগুলা কাগজের না,
প্লাস্টিকের না, পাতার না;
পবনের বৈঠা আইসা জানায়া গেছে, -সোনারও না।
মাইমে হচ্ছে না;
মাদুর তুমি তো উইঠা বইসা দাগগুলোরে কথা শিখাইতে পারো;-
না-হলে আমরা কীভাবে শোনাবো, নৌকাগুলো চাবুকের।

অনুরাগ

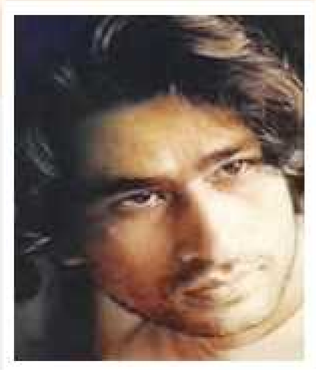

মুজিব ইরম

আর নি হবে রে বন্ধু এত হাসাহাসি, আর নি হবে রে
বন্ধু এত বাসাবাসি! আমিও তোমার নামে
ছাড়িয়াছি ঘর, আমিও তোমার নামে বাঁধিয়াছি ঘর।
তোমারও হইয়াছে গত দেমাগের দিন, আমারও
হইয়াছে জমা দিনে দিনে ঋণ। তবুও তোমার নামে
সুর বাঁধি গাই, তবু তোমার নামে নিজেরে লুঠাই।
আর নি মিলিবে দেখা প্রাণবন্ধু সনে, আর নি
আসিবে পদ বন্ধুয়া বিহনে।
ইরম কান্দিছে নিতি থৈয়া ঝাড়িঝুড়ি,ইরম বান্দিছে
বুকে নিত্য আহাজারি।

সার্বভৌম খামার

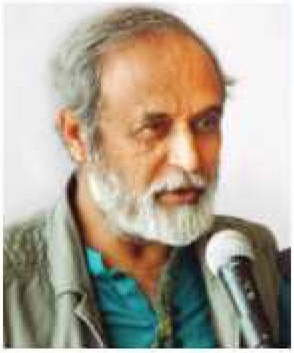

মুহাম্মদ নূরুল হুদা

কতদিন হয়
আমাদের দেখা হয় না;
কতদিন হয় আমাদের কথা হয় না;
না, অন্ধ অনঙ্গের এই প্রায়ন্ধ নীরবতা
আর তো আমাদের সহ্য হয় না।
কেননা আমরা তো অঙ্গধারী;
কেননা আমাদের এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গই
সর্ববিজয়ের তরবারি।

চলো, এবার আমরা
অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হই।
চলো, এবার আমরা
সমরাস্ত্রের ভাষায় কথা কই।
চলো, এবার আমরা
বাজাতে থাকি মহাযুদ্ধের মাদল।
চলো, এবার আমরা
আঙুলগুলোকে বানাই গাঁইতি-শাবল।

আমরা আমাদের মুখ থেকে
বের করবো পারমাণবিক পবন।
তার তাপানল দাবানলের মতো
জ্বালাবে পোড়াবে দৃশ্যমান ত্রিভুবন।
আমরা শ্বেতবিবরকে বানাবো
কালোবিবর, কালোবিবরকে শাদা;
না, আমরা মানবো না কোনো
দিগ্বিজয়ী রাজারাণির বাধা।

আমরা তো প্রজা শুধু পরস্পরের:
আমি তোমার, তুমি আমার।
দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে মিলনানন্দে
আমরা তো উজাড় করবো
আমাদের সার্বভৌম অনঙ্গ খামার।

একটি চিত্রকর্মের জন্য

নাসির আহমেদ

তুমি আমার মর্মলোকে জ্বালিয়ে দাও সেই টিনের চেরাগখানা
যা এই আলো-অন্ধকার ঘুচিয়ে দিয়ে রচনা করে অন্য এক
আলোর তেলখনি এবং উন্মোচন করবে সেই বহির্লোক-
অন্তরে যা কল্পনার দ্যুতি।

নিঃসঙ্গ একশিল্পী যেভাবে আঁকে শূন্যতার তেলচিত্র, চক্রাকারে
ঘূর্ণমান ঋতুর আলো-অন্ধকার, বিবর্ণ হয়ে আসা সবুজ কীভাবে
রং হারিয়ে নেয় নতুন রং শিল্পময় অন্য অনুভব। তুমি আমার মর্মলোকে
জ্বালিয়ে দাও সেই বিবর্ণ পিদিম আলো-যা আমাদের ব্যক্তিগত বিশ্ব থেকে
বহুব্যাপ্ত সাতটি রং ছাপিয়ে ওঠে ধূসর ছাই কিংবা পোড়ামাটির টেরাকোটায়।

আনো স্বপ্নের রং। আঁকতে থাকো তুমি আমার হৃদয়পোড়া মাটির স্লেটে
ক্যানভাসের মহিমা দিয়ে সেই ছবির গভীর বোধে ধূসর মেটে বাদামি রঙে,
আঁকতে থাকো অনুভূতির গভীর রঙে নিঃসঙ্গ শিল্পীরা কী বেদনায় আঁকেন
শূন্যতার দীর্ঘশ্বাস!
আকাশ আর পৃথিবী-এই দুই ভুবন-এর মধ্যখানে কী নিঃসীম শূন্যতার
খা খা চিত্র! মুগ্ধ বিস্ময়বোধের রং মাখিয়ে আঁকো দুঃখ, নগর আর গ্রামের
ধু-ধু রিক্ততার মানচিত্রে উন্নয়ন কীভাবে শিল্পময় হয়ে উঠতে পারে
মানবপ্রেমে তার নির্দেশনা ঝরতে থাক তোমার ইজেল থেকে।

পান্থশালা

সৈয়দ শফিউল ইসলাম

এই পৃথিবীর পান্থশালায়
কেউতো কারো নয়,
তুমি কেন দিচ্ছ রে মন
এত পরিচয়।
তুমি কার কে তোমার
কারে আপন বলো,
কার সাহসে সাহস করে
বীরের মত চলো।
অহংকারে দম্ভ ভরে
করো বাহাদুরি,
অল্প দিনেই হবে যে শেষ
তোমার জারিজুরি।
রাজার ধন পিঁপড়াতে খায়
পিঁপড়া বাহাদুর,
সব হারাবে যেদিন তোমার
বাজবে করুণ সুর।
এই দুনিয়া স্বার্থে ভরা
স্বার্থেরই সংসার,
কেউ কারো নয় স্বার্থ ছাড়া
স্বার্থেরই কারবার।
দেখেশুনেও হলো না জ্ঞান
ভাঙলো না যে ভুল,
বিজ্ঞ সেজে অজ্ঞ হয়ে
হারালে সব কুল।

আমার দেশ বাংলাদেশ

মীর শাহাবুদ্দিন
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

আমার জন্মভূমি এ দেশের মাটি
অমূল্য রত্ন সোনার চেয়েও খাঁটি
এ দেশের কৃষাণ কৃষাণী
অমূল্য ধন রত্নের রাণী
এ দেশের নদীতে বাতাস খায় দোল
নদী বয়ে যায় কলকল
সূর্যের আলো করে ঝলমল
এ দেশে রয়েছে গ্রামের পর গ্রাম
সেখানে রয়েছে লিচু জামরুল জাম
এখানে রয়েছে চারিদিকে সবুজ মাঠ
সেখানে রয়েছে সামিয়ানাসম আকাশ
এদেশ রূপের আধার
রূপ দেখে মন মুগ্ধ আমার
এদেশে রয়েছে সাগর পাহাড়
সবই স্রষ্টার সৃষ্টি মানুষের কিছু নয়
মাঠে প্রান্তরে আসল বাংলার রূপ
যেন স্রষ্টার নিদর্শন স্বরূপ
এদেশের শ্যাম শ্যামলিমা প্রকৃতি
মানুষের বুকে রয়েছে প্রেমপ্রীতি
এদেশে গ্রামে সকালসন্ধ্যা
আজানের ধ্বনি শুনি
এদেশে গ্রামে সকালসন্ধ্যা শাঁখের বাদ্য শুনি
রাতের বেলায় নিথর নিঝুম হয়ে যায় প্রকৃতি
এদেশের বনে রয়েছে বাঘ সিংহ
রয়েছে হরিণ রয়েছে বানর
পানিতে কুমির
এদেশে জন্মে গর্ব জাগে বুকে
নিজের অজান্তে চলে যাই আমি
রূপকথারই গাঙ্গে
রূপের কথা বলে বলে
পারবে না কেউ করতে শেষ
এদেশ আমার জন্মভূমি আমার সোনার বাংলাদেশ

সজাগ হয়ে যাও

মোঃ ওয়াহিদুর রহমান
অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক
বি.এল. কে. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

হাতের মুঠোয় ফোনটা ধরে
করছো হ্যালো হ্যালো
পাহাড় সাগর পাড়ি দিয়ে
কণ্ঠ ভেসে এলো।
এবার ভাবো কণ্ঠ ধ্বনি
শুনছেন কিনা প্রভু
তাই যদি হয় মিথ্যা, গীবত
বলছো কেন তবু?
টিভির পর্দায় নায়িকারে
দেখছো অবিকল
স্রষ্টা যিনি তাঁর কি কঠিন
দেখা শুনা বল?
রাতের আঁধার বাঁধায় না গোল
গভীর সাগর জলে
দূর আকাশে দিবা নিশি
দৃষ্টি যে তাঁর চলে।
তোমার সকল কার্যকলাপ
মনের বাসনা
মহান প্রভু দেখেন শোনেন
সবই তো তাঁর জানা।
ভিডিওতে রাখছো ধরে
শিশুকালের স্মৃতি
ফেরিস্তারা তেমনি রাখেন
আমলনামার নথি।
তাই তো বলি এখন থেকেই
সজাগ হয়ে যাও
আমলনামার মাঝে যদি
ভালো কিছু চাও।
সরল পথে ডাকেন রসুল
সেই পথে সব চলো
তুমি আমি ভালো হলেই
সমাজ হবে ভালো।

বিপন্ন মানবতা

প্রফেসর ড. আবদুর রহমান
সাবেক বিভাগীয় প্রধান
ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

সিরিয়ার শিশুদের আকুতি,
থর থর করে কাঁপছে ধরিত্রী!
সাম্রাজ্যবাদের ঘৃনিত রাজনীতি,
কাঁদছে শিশুহারা মা জননী!
বিশ্বব্যাপী চলছে মনুষত্যহীন খেলা,
শোষকেরা পেতেছে শোষণের মেলা।
এই কি সভ্যতার বিকাশ,
ভাষা নেই জানানোর ধিক্কার।
অভাগা শিশুর রক্তাক্ত শরীর,
ধীরে ধীরে সভ্যতা হচ্ছে স্থবির !
তামাম পৃথিবী হচ্ছে অস্থির,
ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে মায়ের শরীর!
একদিকে গোলা-বারুদের হুঙ্কার,
পাশাপাশি দেখছি ক্ষুধার্তের হাহাকার!
মানুষের মরণ হয়েছে সহজ
চলছে শুধু রাজনীতির বাহাজ।

Trees Turn Trimming
(To Mir Shahabuddin)

Mahboob Ul Alam
Professor, Department of Education

I had carved out my name
But my reputation had gone for a burton
Deceitful decision and behaviour bumbled me
And burnt my boat
No anodyne balm was available
Clumsy lashing and inept handling
Had been clouding the manner and gesture
And my reputation and honour trampled
And I was often barked by dogbody
None was there to hear my harrowing song

My harrowing song could reach you
And you pulled me up
And placed me in comfortable and colourful place
Boors are defeated by friendship
Competence and honour get back its own place
Sullen sky becomes azure
Trees turn into its own colours
Sea is going to its own destination
Surged tide becomes calm
Sunken eyes can see everything normal
Topsyturvi becomes polite and soft
Foolish devices cannot mar the pleasure
Humiliation is erased
And honour is slowly coming back
Garden is blossomed and flowered
Clouds in the sky is broken
Moon is visible

Lamp is put on
Soft breeze is coming from the south
Angry looks turn into sobriety
Sky is rendered pleasantly shadowy
Barbs cannot bark
Soft water flows in stream
Dew is dropping softly on the rose
Wet eyes become dry and seem lofty
Birds are singing and joying
And heart is dressed artistically
Good days are likely to come
Having bliss ever-smiled

So no more shed tears

খোকা থেকে জাতির জনক

মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন খান
প্রভাষক
প্রাইম ইউনিভার্সিটি ল্যাংগুয়েজ স্কুল

খোকা তখন স্কুলেতে পড়ে টুঙ্গিপাড়ায়
সময়ের প্রয়োজনে গর্জে ওঠে দরাজ গলায়
চাই, সকল ন্যায্য দাবী আদায়।
শাসকগোষ্ঠী আতংকে আশু আশংকায়
তেজী তরুণ খোকাকে জেলখানায় পাঠায়
বিবেকবান মেনে নেয়নি, মেনে নেয়নি এত বড় অন্যায়।

মুক্তিপ্রাপ্ত খোকা মনোবলে অবিচল বীরোচিত
আপন জন, আপন ভুবন উৎসাহিত-উৎজ্জীবিত।
নীবরে করে সংকল্প, প্রকাশ্যে করে অঙ্গীকার,
সময়ের দাবী, চাই শতভাগ অধিকার।
কাটে সময়, বাড়ে জেল জুলুম জ্বালাতন,
কালের আবর্তে হয় কিংবদন্তি, হজম করে কত শত নির্যাতন।
জীবন্ত কিংবদন্তির ছয় দফা সারা বাংলায়
মুক্তিকামী জনতার মনের মণিকোঠায়, ব্যাপক সাড়া জাগায়।
সময়ের সাহসী সন্তান বাংলার অবিসংবাদিত নেতা হয়ে যায়,
সেই সাথে বঙ্গবন্ধু মানে বঙ্গের বন্ধু বাংলার বন্ধু উপাধি পায়।
ধারাবাহিক সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে ৭০-এর নির্বাচন হয়,
বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের নিরংকুশ জয় হয়।
ক্ষমতা হস্তান্তর না করে শাসকগোষ্ঠী করে তালবাহানা,
১৯৭১-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে দেন ঐতিহাসিক ভাষণ।

জাতি তখন সংঘবদ্ধ-চাই মুক্তি, চাই স্বাধীনতা,
আর নয় গ্লানি, আর নয় পরাধীনতা ।
২৬ মার্চ,১৯৭১ বঙ্গবন্ধু দেন স্বাধীনতার ঘোষণা,
সাথে সাথেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ইয়াহিয়া হায়েনা।

রক্তক্ষয়ী লড়াই হয়, অবর্ণনীয় নির্যাতন হয়, মর্মান্তিক মৃত্যু হয়
দীর্ঘ ৯ মাস ২০ দিন পর হায়েনারা পরাজিত হয়
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পায়
বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষ স্বপ্নের স্বাধীনতা পায়।
অতঃপর আসে ৭৫, আসে ১৫ আগস্ট কি ভয়ংকর, এ কি ভয়ানক!
ঘাতকের বুলেটে শাহাদাত বরণ করেন জাতির জনক।

বিজয় তুমি

ড. আবু তাহের
সহকারী প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
ইইই বিভাগ

বিজয় তুমি দিয়েছ আমায় এই বাংলায় স্বাধীনতা
বিজয় তুমি দিয়েছ আমায়, লাল সবুজের পতাকা
বিজয় তুমি দিয়েছ আমায় পৃথিবার বুকে শান্তির নীড়
সেটাই হল আমার গর্ব, আমার মাটি, আমার সোনার বাংলাদেশ।

তাই তো আমি ভালবাসি, এই বাংলায় ফিরে আসি,
মরতেও চাই আমি এই বাংলারই বুকে।
জীবন দিয়ে এই মাটিকে করলেন যারা ধন্য
তারাই হোক আমাদের কাছে ভালবাসায় গণ্য।

এমন একটা দিন আসবে থাকব নাকো আমরা
তবু আমরা রেখে যাব সোনার এই বাংলা।
যে বাংলা দেখে সবাই সম্মানে মাথা নত
সেটাই হোক আমাদের আশা আমাদের গর্ব।

বিদেশে আজ আমরা বসে ভাবছি দেশের কথা
কেমন করে সবাই মিলে গড়ব আজ দেশটা।
এই বাংলায় জন্ম নিয়ে তাঁর কাছে যে ঋণী
কেমন করে তার প্রতিদান দিব আমরা জানি।

তাই তো আমরা অর্থ পাঠাই, কঠিন পরিশ্রম করে
ভাল থাকুক বাংলার মাটি ভাল থাকুক দেশ
কারণ আমরা ভালবাসি মা'মাটিকে
প্রাণের চেয়েও বেশ।

শেষ ভাবনা

মোঃ জসীম উদ্দীন সীমান্ত
পিএ টু রেজিস্ট্রার

পরীক্ষাটা শেষ হয়েছে
করবো এখন কি ?
স্বপ্ন দেখি অনেক কিছু
ভাবতে বসেছি।
সব কিছুরই শুরু আছে
আছে আরো বেশ
খাতা ভর্তি লেখার পরেও
'কাইদা' আমি শেষ!
এখন ভাবি জীবনের কথা
কোথায় গিয়ে শেষ হবে এ রাস্তা ?
স্বপ্ন দেখি বুক ভরা
কি করবো বুঝতে আজও পারি না।
ঘর বানাতে খুঁটি লাগে
দালান বানাতে কত কি,
নিজ দেহকে তৈরি করতে
প্রয়োজনটা আমার বাকি।
সাঁতার জানে সাঁতারুরা
আমিও জানি অনেকটা,
ভালোবাসা জানা সত্ত্বেও
কেন ভালোবাসতে পারি না ?
ইচ্ছে ছিল অনেক কিছু
করবো পরীক্ষা শেষে,
সময় তো অনেক গেল
কিছুই হল না জীবনে।
ইচ্ছে শক্তি কমে গেছে
বাস্তবতার সমাজে,
চাইলেই সব হয় না এখন
এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে।
ভাবছি এবার পুরো দমে
লাগিয়ে নিবো নিজেকে,
আল্লাহ যদি সাথে থাকে
চালিয়ে নিব সময়কে।

আমি আমার হতে চাই

স্বরূপ রায়
৩৮তম ব্যাচ,বিএ (অনার্স), ইংরেজি
আই.ডি: ১৫১০১০১০১০১৯

আমি আমার হতে চাই
কারণ আমি নিজেকে ভালবাসতে শিখিনি।
অপরের ভালবাসার মর্মার্থ বুঝে,
হতে পারিনি, বসন্তের হিন্দোলিত হাওয়া
দিতে পারিনি, কারও হৃদয়ে বুলিয়ে,
স্নিগ্ধ ভালবাসার মিষ্টি পরশ।
আমি আমার হতে চাই
কারণ আমি বাবা-মায়ের নিঃস্বার্থ
ভালবাসার মূল্য দিতে শিখিনি।
শিক্ষা-শান্তি-প্রগতির আলো জ্বেলে,
আমি আমার হতে চাই।
আমি আমার হতে চাই
কারণ আমি বুঝতে পারিনি.
ভালবেসে অপরকে আপন করা যায়।
আমি আমার হতে চাই
কারণ জোছনা রাতে কেউ আমাকে নিয়ে ভাবেনি,
দ্যাখেনি কোন স্বপ্ন,
স্পন্দিত হয়নি কারও হৃদয় আমাকে দেখে।
তবুও হৃদয়টা ভালবাসতে চায়।
প্রার্থনা রইল সেই হৃদয়হীনাদের প্রতি।
আমি আমার হতে চাই
কারণ কেউ আমাকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বোনেনি।
তবুও আমার হৃদয়টা ভালবাসতে চায়।
চায় দূরের কোন মেঠো পথ বেঁয়ে হেঁটে যেতে,
নীলাঞ্জনার নীলাভ চোখের দ্যুতিময় আভায় নিজেকে হারাতে,
অধর রাঙ্গাতে ভালবাসার পরশে।
জানি চাইলেই সব হয় না,
দারিদ্রের অভিযোগে আমার জীবনটা আজ বিষাদ সিন্ধু
ভালবাসা দিয়ে গেছে এক ফোঁটা কষ্টের শিশির বিন্দু।
তবুও হৃদয়টা যেন ষোড়শীর হতে চায়।
তাকে আপন করে পেতে চায়।
কোকিলের মিষ্টি সুর অবগাহন করে,
ষোড়শীর চোখে নিজেকে হারিয়ে আজ,
আমি আমার হতে চাই।

স্বপ্নময় প্রাইম ইউনিভার্সিটি

মোঃ শামীমুর ইসলাম
৪১তম ব্যাচ, বিবিএ
আই.ডি: ১৬১০২০১০১০২৮

আমরা এনেছি মান
এনেছি সম্মান
সারাদেশে করেছি প্রমাণ
শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার,
প্রাইম ইউনিভার্সিটির জয়জয়কার
যেদিকে তাকাই সেদিকে দেখি
প্রশাসনিক কিংবা দাতব্য
সমাজে যত সম্মানিত স্থানে
আমরা আছি আসীন
তাই আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার
প্রাইম ইউনিভার্সিটির জয়জয়কার
বিতর্কসহ সকল সহশিক্ষা কার্যক্রমে
খুঁজে দেখো, দেখবে সেথায়
সেথাও আমরাই দাবিদার
আমাদেরই জয়জয়কার
আনবো সুনাম, করবো অর্জন
পরবো শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট
এ আমাদের অঙ্গীকার
আমরাই শ্রেষ্ঠ
শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার
প্রাইম ইউনিভার্সিটির জয়জয়কার।

বাস্তব জীবন

সাব্বির আহমেদ
৪১তম ব্যাচ, বিএসসি, ইইই
আই.ডি: ১৬১০৩০৩০১০৪৪

এই মুহূর্তে আমি ভীষণ বিরক্ত,
কম্পিউটার ভাইরাস করছে উত্যক্ত!
পারছি না কোন কাজ ঠিকমত করতে,
কিভাবে করবো তাও পারছি না জানতে!
একবার ভাবি সবকিছু ধুয়ে মুছে ফেলি,
চাইলেও কি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি?
ঝামেলার সাথে যুক্ত আছে কম্পিউটার-
বলতেও পারছিনা, 'এটা কোন ব্যাপার!
আমাদের জীবনেও কত সমস্যা রয়ে গেছে,
সেগুলোর অনেকটাই অসমাপ্ত হয়ে আছে!
আমরা তো নই মানুষরূপী কোন যন্ত্র,
বিকল হলে ঠিক করে দেবে কোন মন্ত্র!
আমাদের আছে আবেগের ছটা আর ভালবাসা,
আরও আছে আমাদের জীবনের কত আশা!
সামাজিক জীব হিসাবে আছে কত দায়িত্ব,
ঘরে বাইরে সবখানেই আছে কাজের গুরুত্ব
এরপরে আছে কত সমস্যা! এড়ানো নাহি যায়!
খুব সহজেই তো আমার কম্পিউটার বদলে ফেলি,
কিন্তু জীবনের সমস্যাগুলো কিভাবে এড়িয়ে চলি?

তুরাগ নদী

হাসান মোহাম্মদ শরিফুল হক
৪২তম ব্যাচ, এল.এল.এম
আই.ডি: ১৬২০৫০১০৪০১০

হে তুরাগ নদী
তোমার তারুণ্য দেখিনি আমি
দেখিছি যৌবন,
ভুলেছি তোমায় দেখে, ছিল যত মৌবন।

একি দশা তব আজ,
গড়িল কে যত সাজ।
চপলা গতি তব কে করিল রত,
নূপুর খুলে তোমায় বাঁধিল কে শিকল !

চক্ষু দিয়ে ঢুকতে যবে আমার হৃদ-গহীনে,
ছলাত্ ছলাত্ শব্দে আমার পুলক যেত বেড়ে।
উন্মাদনার ঢেউয়ে যখন বইত মৃদু হাওয়া,
ছান্দসিক অনুভবে হতো তোমায় পাওয়া !
কে করিল বন্দী তোমায়, কে থামাল গতি,
ইট বালি আর কংক্রিট দিয়ে বানিয়ে যত যতি !

স্রোতস্বিনী হে যৌবনবতী
হয়ে অদম্য গতির ধারা
আপন মহিমায় ধাবমান হও
মাড়িয়ে যত বাধা !!

স্বার্থপর

মোঃ শামসুল আকরাম
৪২তম ব্যাচ, সিএসই
আই.ডি: ১৬২০৩০১০১০০৫

কোন এক সাঁঝের বেলায়
শুয়েছিনু বিছানায়
নিয়ে মোর দামী মুঠোফোন খানা।
ফেইসবুকে চ্যাটিং
চলিতেছিল সেদিন
শুধুই তোমার সাথে।
বহুক্ষণ ধরে বহুকথা শেষে
হঠাৎ কি যেন এক অজানা শঙ্কা
হানা দিল মোর মনে।
প্রশ্ন করিনু
কোনদিন যদি হারিয়ে যাই আমি
কি করিবে তবে?
আবেগের ছলে বলেছিলে মোরে
ওরে বুদ্ধু
আমি তা হইতে দিবো কবে?
চলিল দুদিন
মধুময় সুদিন
অতঃপর যেদিন চলে গেলে তুমি
মোরে নিঃসঙ্গ একা করে।
অঝোর নয়নে কেঁদেছিনু আর
বুঝেছিনু তোমার কথার মানে।
বলেছিলে মোরে দিবে না হারিয়ে যেতে
মুই বোকা বলে ভাবিনি উল্টো করে।
আজ বুঝি হায়
কি ছিল তোমার কথার অন্তরালে।
হারিয়ে গেছো তুমি
ঠিক যে ভাবে এসেছিলে!
শুধু আমি বাঁচতে পারি না
আগের মত করে।
কাটাতে পারি না তব ইন্দ্রজালের মোহ।
অদ্ভুত তুমি!
কেমনে অভিনয় করেছিলে নিঃস্বার্থের মত?

Unpaid Intern

Md. Farhan Abid Eham
44th Batch, BA (Hons), English
ID: 171010101001

If nobody pays for it
Then no one gets paid for it
And who can afford to go unpaid
But the rich?

An unpaid internship is not an opportunity
It's a risk, a risk for those,
Without a bedroom in a family home.
Where they can stay rent free
While you bleed them to the bone.
I'm sorry this job is only available to those
Who can afford to go a month without income.

Can't you see? Can't you see?
How this prevents the poor from opportunities?
When you open the gates to your massive company
Do you want a C.V.?
Or would the deeds to a trust fund prove more necessary?
You can only have this work experience if you can afford to work for free.

Can't you see? Can't you see?
How this prevents the poor for opportunities?

YOUR REPUTATION IS NOT CURRENCY.

Do you know how it feels when the door is shut?
When there's no feasible way at all of moving up?
When every job requires experience and that is always given to someone well off.

Without a dime
How cruel it is to have dreams
When they've sewn up
Every possibility
In the impenetrable fabric of working for free.

সংগ্রাম

রাজু আহমেদ
৪৪তম ব্যাচ, এল.এল.বি (অনার্স)
আই.ডি: ১৭১০৫০১০১০০২

মানুষের জীবনে কিছু সময় আসবে আঘাত
সেটা হবে সামনে যাওয়ার পথ।
সবাই মনে করে আমার অনেক দুঃখ
আমি আর কি করব।

দুঃখ আছে যার, সফলতা হবে তার
কিছু সময় পর।
দুঃখ আছে বলে, মানুষ পারবে না বলে
তখনই সে হারে।

সংগ্রাম করতে হবে জীবনের সাথে,
অতীত ভুলে সামনের দিকে।
মহীতে আছে সুখ, মহীতে আছে দুঃখ
দুটোর মধ্যেই মানুষ বদ্ধ
জীবনযুদ্ধে করবে লড়াই,
পিছনে তাকাবে না কোন সময়।
জীবনে আসবে বাধা,
মুখোমুখি হবে তারা
জীবন সংগ্রামী যারা।
ফুল সুন্দর কিন্তু কাঁটা আছে
জীবন সুন্দর কিন্তু বাধা আছে।

মনোবল

হাফিজুর রহমান
৪৪তম ব্যাচ, বিএসসি, ইইই
আই.ডি ঃ ১৭১০৩০৩০১১২৫

বিপদ দেখে করিব না ভয়
বিপদে থাকবো নির্ভয়।
চারিদিকে শত কান্নার আওয়াজ
ছুটে যাবো তার কাছে
মুছে দেবো নয়নের জল
দাঁড়াবো তার পাশে।

আমরা সবাই বীর
মোদের কিসের ভয়?
সৃষ্টিকর্তা সবই দিয়েছে
সকল বাধা রুখবার সম্বল।
আছে আমাদের মনোবল।

এটা পারবো না, সেটা পারবো না
কি আছে এমন তার কাছে
সৃষ্টিকর্তা দিয়েছে মোদের সফলতার সম্বল।
আর সেটা আমাদের মনোবল।

নির্মমতা

কাজী মাহামুদুল হাসান
৪৪তম ব্যাচ, বিবিএ
আই.ডিঃ ১৭১০২০১০১০১৭

কি দিয়ে যে শুরু করি
ভাবছি আমি তাই,
বিষয়টাকে নিয়ে দেখো
কষ্টের শেষ নাই।
যাদের জন্য জন্ম মোদের
বৃদ্ধাশ্রমে রাখছি তাদের,
কত যত্নে মানুষ করে
বড় হয়ে রাখি না ঘরে।
বাজে জিনিস মনে করে
বৃদ্ধাশ্রমে আসছি ছেড়ে,
নিচ্ছি না খোঁজ ব্যস্ততাতে,
দুনিয়া নিয়ে আমরা মেতে।
খেলো কিংবা নাই বা খেলো
মোদের কি-বা আসে-গেলো,
জন্ম দিয়ে কি পাপ করে
যার কারণে কষ্টে মরে।
সারা জীবন নষ্ট করে
মানুষ করে আঁকড়ে ধরে
আমরা না খেলে খায় না তারা,
এই কি তাদের জীবন ধারা
দুনিয়া মোদের হয়েছে কানা
বৃদ্ধাশ্রম তাদের শেষ ঠিকানা।

আমার মা

মোঃ আতাউর রহমান তুরাক
৪৬তম ব্যাচ, এল.এল.বি (অনার্স)
আই.ডিঃ ১৭৩০৫০১০১০০২

মা গো তুমি সোনার খনি,
আমার চোখের মনি।
দূর আকাশের তারা তুমি,
আমার স্বপ্নের তরী।
আল্লাহ এবং নবীর পরে,
মা-জননীর স্থান।
তাই ত ভাবি কী করে যে
রাখি মায়ের মান।
মা তোমারি জন্য মরতে পারি,
মা তোমারি জন্য বাঁচতে পারি,
মা তোমার সুখেই আমার জীবন পূর্ণ,
এ কামনা করি।
মাকে নিয়ে পাড়ি দেবো আমার জীবন তরী,
কি করলে যে পূর্ণ হবে,
মা তোমার মনের আশা।
দুআ করি পূর্ণ হোক,
মা তোমার সকল আশা।

বসন্তের রঙ ঢং

মোঃ আব্দুল মোহাইমিন
৪৭তম ব্যাচ, বিএসসি, ইইই
আই.ডি: ১৮১০৩০৩০১০৯১

আঁখি মেলে দেখি, প্রভাতের ভানুর উঁকি,
ঝিলমিল কিরণে, পুষ্পবৃক্ষ অপূর্ব সাজে।
বঙ্গভূমির মাঝে মধু সৌরভ সুগন্ধ ছাড়ায় আজ
এসেছে বসন্ত ঋতুরাজ।

শিমুল মান্দার পলাশ কৃষ্ণচুড়ার ডালে,
ফুটেছে ফুল স্ব স্ব বর্ণের আদলে।
উড়ছে কতো বুলবুলি দোয়েল কোকিল টিয়ের ঝাঁক,
এসেছে বসন্ত ঋতুরাজ।

বাগিচায় পুষ্পভরা নন্দন মুহুর্মুহু গন্ধের মাঝে,
প্রজাপতি মৌ কীট পতঙ্গ ব্যস্ত মধু আহরণ কাজে।
ফাল্গুনে ঝরে জীর্ণপাতা, বৃক্ষ নতুন সাজে,
এসেছে বসন্ত ঋতুরাজ।

প্রকৃতির প্রেমে মুগ্ধ মনে এসো করি বিচরণ,
রবে সুস্থ, হবে সুন্দর মোদের জীবন।
বসন্তের প্রাক্কালে, প্রকৃতি সুরক্ষায় সজাগ হই আজ,
বরণ করি হে বসন্ত, এসেছে সঙ্গে ঋতুরাজ।

অন্তর্জাল

ফারহানা জেবিন রিতু
৪৪তম ব্যাচ, বিএসসি, সিএসই
আই.ডি: ১৭১০৩০১০১০৫২

তুমি কি সকালের
মিষ্টি রোদটা দেখেছ?
দেখা হয়নি তোমার,
তাই বুঝতে পারনি আমায়।
দেখেছ কি ক্লান্ত দুপুরের কাকটাকে?
যে কিনা ডানা ঝাপটায় নেশা তার উড়বার
দেখনি তুমি, তাই
ভিজতে পারনি ক্লান্ততায় আমার।
চোখের ভাষায় বুঝেছ কি
গোধূলির রক্তিম আভায়?
বোঝনি বুঝি, তাই
আজও অবুঝ ভাবি আমি তোমায়।
তোমার দুচোখ খোলা ছিল কি,
যখন রাতের আকাশে লক্ষ তারা
এক নিরব ঝিলিমিলিপাতা,
নিশিজাগা পাখিদের গুঞ্জন আসি ভেসে?
জানি, সে রাত ছিল না তোমার।
তাই দেখেও বুঝবে না
আর এ আমার।
আমি সকালের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রজাপতি,
কিংবা মিষ্টি রোদের আভা
আমি ক্লান্ত দুপুরের, উত্তপ্ত রোদের
ডানা ঝাপটানো পাখিটা।
আমি গোধূলি রাঙা সন্ধ্যার আঁধারে
আলেয়ার আলো কিংবা
মরুভূমির তপ্ত মরীচিকা।
আমি রাতের আকাশে হাজার তারার
মেলায়, এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।
কখনও কি খুঁজে দেখেছ?
মনের অবচেতন কোণে তোমায়?
খুঁজে দেখ পাবে আমায়
এই তো, অন্তিম আমি
তোমাতেই যে মিশে আছি।

আমার চাঁদ

আশরাফ মন্ডল
৪৩তম ব্যাচ, সিএসই
আই.ডি: ১৬৩০৩০১০১০০৪

বলি আমি তোকে চাঁদ,
মিথ্যা বলে আমি তোকে করেছি অবহেলা।
তোর আলোয় ঘাসের বুকে রেখেছি যে মাথা।
দেখেছি আমি তারাদের অনেক রঙ্গের খেলা।
ও চাঁদ দিসনে আমার সাথে আড়ি, দিয়েছি তারে কথা।
দিনের বেলা খুঁজে বেড়াই, পাইনা তোর দেখা।
যাসনে চলে তুই চাঁদ, মনে লাগে ব্যথা।
বলি আমি তোকে চাঁদ, কখন দিবি দেখা।
তুই ছাড়া, মনে হয় আমি যে একা।
অনেক তারার ভিড়ে আমি খুঁজে পেলাম চাঁদকে।
ছড়িয়ে দিল আলোর আভাস, ভরিয়ে দিল মনকে।
চাঁদ বলে,
ঘাসের বুকে মাথা রাখো, দেখতে পাবে আমাকে।
ভালবেসে হাত বাড়াও, যদি ধরতে চাও চাঁদকে।
পেতে চাইলে আমাকে, বুঝতে হবে রাতকে।
ভ্রমর হয়ে হাত বাড়ালাম, চাঁদ ছেড়ে দিল আমাকে।

মা

মিফ্তাহুল জান্নাত মিষ্টি
৪৯ তম ব্যাচ, এলএলবি (অনার্স)
আই.ডি: ১৮৩০৫০১০১০৫৪

হাতের ছোঁয়া পাই না আমি
পাই না মাছের ঝোলের গন্ধ
কি আর করি চুপটি করে থাকি বসে
এটাই বুঝি ভাগ্য
পড়তে আমায় দেয় না মাগো
মশা করে জব্দ
দেখতে আমি পাই না মাগো
এইটা বুঝি যুদ্ধ।

কুয়াশা নিয়ে আসে শীত
চার ঋতুর পরে
শীতের জামা কিনার সুযোগ
হয় না টাকার কারণে,
ভাপাপিঠা হয় না খাওয়া
হয় না যাওয়া ঘুরতে
মাগো তুমি কত দূরে
কাঁদি দিবা রাত্রে।

শূন্য মনে থাকি চুপে
বুঝে না কেউ ব্যথা
চোখের জলে যায় যে ভেসে
শুধুই নিরবতা।
হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে
করে না কেউ আদর
খাওয়ার শেষে হাত মুছতে
পাই না তোমার আঁচল।

দিনের শেষে ঘরে ফিরি
ক্লান্ত হয়ে আমি
মাগো তোমায় পাই না কাছে
সদাই আমি খুঁজি।
মানুষ হয়ে জন্মে আমি
করি জীবনযুদ্ধ
কবে তোমায় কাছে পাব
ভাবি দিবারাত্র।

স্মৃতিচারণমূলক রচনা

ফরিদুর রেজা সাগর	:	অদ্ভুত এক কান্ড
জসীম মাহমুদ	:	স্মৃতির পাতা থেকে
নাজনীন জামান	:	একজন শিক্ষকের অভিজ্ঞতা
মীর আহমেদ হুসাইন (হাসান)	:	আমার স্মৃতিতে একজন বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা: প্রেক্ষাপট

অদ্ভুত এক কাণ্ড

ফরিদুর রেজা সাগর

অনেকদিন আগের কথা। ওয়াল্ট ডিজনির জন্মদিন উপলক্ষে বিটিভিতে একটা বিশেষ অনুষ্ঠান করব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি আর আলী ইমাম দু'জনে মিলে অনুষ্ঠানটি করব। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাগবে। সেটাও পাওয়া গেল। অর্থাৎ অনুষ্ঠানটি করতে কোনো বাধা নেই। দু'জনে অনেক খেটেখুটে অনুষ্ঠানটি বানালাম। বিটিভিতে সেটি প্রচারও হলো। বিটিভির ভেতরে-বাইরে অনেকেই প্রশংসা করলেন। পরিচিতজনও 'ভালো' বললেন। বন্ধু-বান্ধবদেরও প্রশংসা পেলাম। আমি আর আলী ইমাম বেজায় খুশি। অনুষ্ঠান ভালো হয়েছে, তাই বেশ বুক ফুলিয়েই বিটিভি ভবনে যাই আর আসি। হঠাৎ শুনলাম, বিটিভির মহাপরিচালক আমাদের জরুরিভাবে তলব করেছেন। সেই সময়ে মহাপরিচালক ছিলন মুস্তাফা মনোয়ার। তিনি কেন আমাদের জরুরিভাবে তলব করেছেন, সেটা কেউ বলতে পারছেন না। অনুষ্ঠানের প্রযোজক খালেদা ফাহমিকে জিজ্ঞেস করেও কোনো ক্লু খুঁজে পাওয়া গেল না। খালেদা ফাহমি বললেন-মহাপরিচালক স্যার যখন ডেকেছেন...যাও দেখা করো। ভয় কিসের? খালেদা ফাহমির কথায় মনে হলো তিনি ব্যাপারটা জানেন, কিন্তু বলছেন না। এ কথা সত্য, আমরা মোটেও ভয় পাইনি। কিন্তু মুস্তাফা মনোয়ার কেন ডেকেছেন, সেটা জানতে পারলে ভালো হতো। একটা প্রস্তুতি নিয়ে তার সামনে যাওয়া যেত। বিটিভির আরেক কর্মকর্তা মোস্তফা কামাল সৈয়দের কাছেও ব্যাপারটা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি একটু আভাস দিলেন। ওয়াল্ট ডিজনির জন্মদিনকে ঘিরে আমরা যে অনুষ্ঠানটি করেছি, সেটা নিয়েই মুস্তাফা মনোয়ার আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান। তার মানে অনুষ্ঠান কি ভালো হয়নি? এত মানুষ অনুষ্ঠানটির প্রশংসা করল অথচ মহাপরিচালকের পছন্দ হলো না!
পরের দিন আলী ইমামকে নিয়ে ভয়ে ভয়েই তার সঙ্গে দেখা করলাম। তার রুমে ঢুকতেই সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন-এই যে, তোমরা এসেছ...। তোমাদের অনুষ্ঠান কেমন হয়েছে। লোকে কী বলে? আমি আর আলী ইমাম কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এক পর্যায়ে আমিই সাহস করে বললাম-স্যার, লোকে তো বলে, অনুষ্ঠান ভালো হয়েছে।

মুস্তাফা মনোয়ার এবার সরাসরি আমাদের দু'জনের মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু আমরা কেন যেন তার মুখের দিকে তাকানোর সাহস পাচ্ছি না। হঠাৎ তিনি বললেন, হ্যাঁ তোমাদের অনুষ্ঠান ভালো হয়েছে...। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে...

অনুষ্ঠান ভালো হয়েছে শুনে খুশিতে মন ভরে গেল, কিন্তু 'আমার একটা প্রশ্ন আছে' শুনে এবার সত্যি সত্যি দমে গেলাম। প্রশ্ন আছে মানে কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে। যেটা অন্য কেউ ধরতে না পারলেও মুস্তাফা মনোয়ার ধরতে পেরেছেন। হ্যাঁ, আমরা একটা ভুল করেছি। ভেবেছিলাম, সেটা প্রযোজক থেকে শুরু করে অন্য কেউই যখন ধরতে পারেননি; মুস্তাফা মনোয়ারও হয়তো ধরতে পারবে না। কিন্তু অভিজ্ঞতার তো একটা শক্তি আছে। তা ছাড়া মুস্তাফা মনোয়ার বলে কথা। তার কাছে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়।

মুস্তাফা মনোয়ার আমাদের মুখের দিকে তাকিয়েই আছেন। আমরা দু'জন যারপরনাই অপ্রস্তুত। তিনি আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখছেন? হঠাৎ জানতে চাইলেন-ওয়াল্ট ডিজনি সম্পর্কে তোমাদের পড়াশোনা কেমন?

আলী ইমাম ফট করে বললেন, স্যার, ভালোই। মুস্তাফা মনোয়ার এবার আরও গভীরভাবে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা, ওয়াল্ট ডিজনির জন্মদিনটা আসলে কত তারিখে ? আমরা দু'জন চমকে উঠলাম। আসলে আমরা যে ভুলটা করেছি তা ধরা পড়েছে। তখনকার দিনে বিটিভিতে যে কোনো ছুতোয় অনুষ্ঠান করার কথা ভাবতাম। কারণ অনুষ্ঠান করলেই একটা 'চেক' পাবো। এই চেকের আগ্রহেই ওয়াল্ট ডিজনির জন্মদিন নিয়ে অনুষ্ঠান বানিয়েছিলাম। মুস্তাফা মনোয়ার এবার গম্ভীর হয়ে বলরেন, জন্মদিন পালন ছাড়াও ওয়াল্ট ডিজনিকে নিয়ে একটা নয় একাধিক অনুষ্ঠান হতে পারে। কিন্তু তোমরা ভুল জন্মদিন পালন করলে কেন? শোনো, তোমাদের দু'জনকে আমি বেশ পছন্দ করি। তোমরা যা করো মনোযোগ দিয়েই করো। কোনো ফাঁকিঝুকি দেও না। তবে ভবিষ্যতে এমন ভুল আর করবে না। যাও, মনোযোগ দিয়ে কাজ করো।

সেদিন ভয়ে ভয়ে তার রুমে ঢুকেছিলাম। কত কথাই না ভেবেছিলাম-হয়তো আমাদের শাস্তি দেবেন; অনেক বকাঝকা করবেন। এসবের কিছু করেননি মুস্তাফা মনোয়ার। বরং পরম মমতায় আমাদের ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছেন। আজও সেদিনের কথা মনে পড়ে। বিশেষ করে মুস্তাফা মনোয়ারের ওই দিনের মুখচ্ছবি মাঝে মধ্যেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শাসন করা মুখও যে অনেক ভরসা দিতে পারে, সেদিন বুঝেছিলাম। সেই থেকে মুস্তাফা মনোয়ারের সঙ্গে দেখা হলেই তাঁর মুখের দিকে তাকাই। এখনও প্রেরণা পাই।

আরও একদিনের ঘটনা। বিটিভিতে ঢুকেছি। হঠাৎ মোস্তফা কামাল সৈয়দের পিয়ন এসে বলল, আমাকে আর আলী ইমামকে তিনি ডেকেছেন। ব্যাপারটা খুবই জরুরি। আলী ইমামসহ মোস্তফা কামাল সৈয়দের রুমে ঢুকলাম। মনে হলো তিনি আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দেখে গভীর আগ্রহ নিয়ে বললেন, অ্যাই শোন, তোমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের কাছে পাঠাব। তিনি বোধ করি তোমাদের দু'জনকে কিছু বলতে চান। আসলে কী বলতে চান, সেটা আমাকে বলেননি। শুধু বলেছেন, তোমাদের দু'জনের সঙ্গে কথা বলতে চান। আমার ধারণা, চিকিৎসা সম্পর্কিত কোনো অনুষ্ঠানের আইডিয়া নিয়ে হয়তো কথা বলবেন। তোমরা আজই তার সঙ্গে দেখা করে এসো।

মোস্তফা কামালের কথামতো আমি আর আলী ইমাম মহাউৎসাহে ওই চিকিৎসকের চেম্বারের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় রওনা দিলাম। দু'জনে অনেক জল্পনা-কল্পনা করছিলাম। নতুন অনুষ্ঠান বানাব। তাও আবার চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে। নিশ্চয়ই খুব ভালো হবে। ধানমণ্ডিতে চিকিৎসকের চেম্বারে গিয়ে তো আমরা অবাক। তার বাড়ির নিচতলায় চেম্বার। ঢোকার মুখে দেখি স্টেডিয়ামের গ্যালারির মতো উঁচুনিচু পাটাতনে অনেক রোগী বসে আছেন। অনেকে দাঁড়িয়েও আছেন। পরিচয় দিতেই চেম্বারের একজন কর্মী ব্যস্ত হয়ে বললেন, আপনারা এসেছেন? আসেন আসেন...। স্যার বারবার আপনাদের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। ওই কর্মীর পিছু পিছু ভেতরের রুমে ঢুকে আমরা দু'জন আরও বেশি অবাক হলাম। বাইরের গ্যালারির মতো ভেতরেও আরেকটা গ্যালারিতে অনেক রোগী বসে আছেন। তাদের সামনেই চিকিৎসক একজন রোগীর সঙ্গে কথা বলছেন।

আমরা এসেছি শুনে রোগী দেখা বাদ দিয়ে ব্যস্ত হয়ে বললেন-কই, বিটিভি থেকে কে এসেছে...? আমরা দু'জন গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। ইতিমধ্যে অপেক্ষমান রোগীদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। তাদের ধারণা, আমরা সিরিয়াল ব্রেক করেছি। নানাজনে নানা কথা বলতে থাকল। চিকিৎসক আমাদের নিয়ে পাশেই একটা ছোট্ট ঘরে বসলেন। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, বিটিভিতে তোমাদের অনেক অনুষ্ঠান আমি দেখেছি। আমার ধারণা, কাজটা তোমাদের দিয়েই হবে। তোমরা ছাড়া এই কাজ কেউ করতে পারবে না। তোমরা কি চা খাবে?

চা হলে মন্দ হয় না। কিন্তু আমরা তো সম্ভাব্য টিভি অনুষ্ঠানের আইডিয়া পাওয়ার আশায় উন্মুখ হয়ে আছি। চিকিৎসাবিষয়ক নতুন অনুষ্ঠান। যদি জমানো যায় তাহলে তো 'চেক' পেতে অনেক সুবিধা হবে।

চিকিৎসক আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমরাও তাঁর মুখের দিকে তাকাচ্ছি আর পরস্পরের মধ্যে ইশারায় মত বিনিময় করছি। হঠাৎ চিকিৎসক আবার একই মন্তব্য করলেন-হ্যাঁ, আমি মোটামুটি নিশ্চিত, কাজটা তোমাদের দিয়েই হবে। তোমরাই পারবে। সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম-স্যার, আসলে কাজটা কী?

চিকিৎসক এবার যা বললেন তা শুনে আমি আর আলী ইমাম শুধু বিব্রত নই, লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না।

মূল ঘটনা হলো-ওই চিকিৎসক জাপান থেকে একটি টেলিভিশন সেট আনিয়েছেন। তখনকার দিনে সবার ঘরে এখনকার মতো টেলিভিশন সেট ছিল না। ঢাকা শহরে হাতেগোনা কিছু মানুষের ড্রয়িংরুমে টিভি সেট স্থান করে নিয়েছে। তারই একটি ছিল ওই চিকিৎসকের বাসায়। কয়েকদিন আগে হঠাৎ তার টিভি সেট বন্ধ হয়ে যায়। কথা বলে না। টিভি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চিকিৎসক মহাবিপদে পড়েছেন। কারণ তার মা টিভিতে নিয়মিত অনুষ্ঠান দেখেন। টিভি বন্ধ তাই অনুষ্ঠান দেখতে পারছেন না। ফলে মায়ের মন খারাপ। চিকিৎসকের ধারণা জন্মেছে, আমরা দু'জন যেহেতু নিয়মিত টিভি অনুষ্ঠান বানাই, কাজেই টেলিভিশনের অসুখ সম্পর্কে আমাদের নিশ্চয়ই ধারণা আছে। আমরাই পারব টেলিভিশন ঠিক করতে।

চিকিৎসক বারবার জোর দিয়ে বলতে থাকলেন, আমার ধারণা তোমরাই পারবে টেলিভিশনটা ঠিক করতে। তোমরা ছাড়া এই কাজে আমি কারও ওপর ভরসা পাচ্ছি না।

আমি আর আলী ইমাম লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। চিকিৎসক এসব কী বলছেন? আমাদের কি 'টেলিভিশনের মেকার' ভেবেছেন! নষ্ট টেলিভিশন ভালো করব কী করে? এটা কারিগরি ব্যাপার। চিকিৎসককে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। আমরা যতই বোঝাই তিনি ততই আমাদের ওপর বিশ্বাস রেখে বলতেই থাকেন-না, না, তোমরা পারবে। যাও আমার টেলিভিশনটা ঠিক করে দাও। পিয়নকে ডাক দিলেন। সে আমাদের ওপর তলায় চিকিৎসকের বাসায় নিয়ে গেল। আমি আর আলী ইমাম মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। কী করা যায় ভাবছি। চিকিৎসকের মা আমাদের দেখে খুশি হয়ে বললেন-ও তোমরা এসেছ। দেখো তো, টিভিটা কথা বলে না কেন?

আমরা কঠিন পরীক্ষায় উপনীত। না বলার কোনো পরিস্থিতি নেই। সুযোগও নেই। আমরা টেলিভিশনও ঠিক করতে পারি এটাই প্রমাণ করতে হবে। আলী ইমাম বললেন, সাগর, চলো টেলিভিশন ঠিক করার অভিনয় করি। দেখা যাক তারপর কী হয়? দু'জন মিলে টেলিভিশন সেটটা গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকলাম। ভাবটা এমন, আমরা টেলিভিশনের যন্ত্রাংশের খুঁটিনাটি জানি। নব ঘুরিয়ে টেলিভিশ চালু করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। যেখান থেকে বিদ্যুতের লাইন এসেছে তা দেখার চেষ্টা করি। টেলিভিশনের পেছনের কিছু বৈদ্যুতিক তার নাড়াচাড়া করতেই হঠাৎ দেখি টেলিভিশনটা শব্দ করে উঠল। আমরা তো অবাক। বোঝা গেল, টেলিভিশনের পেছনের দিকে যে সকেট আছে তা একটু ঢিলা হয়ে গিয়েছিল। সে কারণে টেলিভিশনটা চালু হতো না। সকেট টাইট করে দিতেই টেলিভিশন কথা বলা শুরু করল। চিকিৎসকের বৃদ্ধা মা খুশিতে হাততালি দেওয়া শুরু করলেন। খবর পেয়ে ওই চিকিৎসক রোগী দেখা বাদ দিয়ে দোতলায় তার বাসায় উঠে এলেন। আমাদের দু'জনকে বারবার সাধুবাদ দিতে থাকলেন। আমাদের দু'জনের হাতে ১০০ টাকা ধরিয়ে দিলেন। আমরা যতই বলি টাকা লাগবে না ততই তিনি টাকা নেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। টাকাটা নিয়েছিলাম। তবে অনেকদিন সে টাকা খরচ করিনি। সেদিন আনন্দে ওই চিকিৎসক এবং তার বৃদ্ধা মায়ের মুখ এতটাই উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল যে, আমি চোখ সরাতে পারছিলাম না। আজও যখন আনন্দময় ওই দুটি মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন সত্যি সত্যি কাজে-কর্মে প্রেরণা পাই। পাঠক, নিশ্চয়ই সম্মানিত ওই চিকিৎসকের নাম জানতে ইচ্ছে করছে। তিনি আর কেউ নন, আমাদের দেশের বরেণ্য চিকিৎসক প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ডা. নূরুল ইসলাম। এ মুহূর্তে তাঁর মায়াভরা মুখটা আমার চোখের সামনে আসছে। আহ্ ! কী মায়া !

স্মৃতির পাতা থেকে

জসীম মাহমুদ
সহকারী পরিচালক (নিরীক্ষা)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষার্থীরা যখন চোখভরা কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করে, 'কী পড়ব? কী করব?' আমরা তখন বলি, নিয়মিত ক্লাস করো, লেকচার টুকে নাও, আর ক্লাস শেষে হারিয়ে যাও প্রকৃতির রাজ্যে।

ছয় ঋতুর প্রতিটির যে আলাদা রং আছে, রূপ আছে, টের পাওয়া যায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লে। নবীন শিক্ষার্থীরা, ক'দিন আগে কুয়াশাভেজা ক্যাম্পাস তোমাদের স্বাগত জানিয়েছে। এখন হঠাৎ হঠাৎ তোমাকে হয়তো চমকে দেবে কোকিলের কুহু ডাক। আবার কয়েক দিন পরই পয়লা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রার আনন্দে রঙিন হবে পুরো ক্যাম্পাস। প্রকৃতির এই প্রতিটি আয়োজনে শামিল হতে ভুলো না।

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ঝুমবৃষ্টির দেখা পাবে এই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সামনের বর্ষায় আমি হয়তো থাকব না, কিন্তু জানি উদ্দাম বর্ষায় ভিজবে তুমি। যেমনটা আমি ভিজেছিলাম। শাটল ট্রেনের বিশ্ববিদ্যালয় পুরো বাংলাদেশে এই একটাই। শরতে কাশফুলে ঢাকা পাহাড় ছুঁয়ে সাপের মতো শাটল এগিয়ে চলে। ট্রেনের ভেতর বগি বাজিয়ে চলে গান-বাজনা, আড্ডা, হুই হুলোড়। কলকাতার যেমন কফি হাউস, আমাদের আছে ঝুপড়ি। আমরা বলি, ক্যাম্পাসের ঝুপড়ি কখনো ঘুমায় না। এখান থেকেই ডাক এসেছে কত প্রগতিশীল আন্দোলনের, উঠে এসেছে কত নিত্যনতুন আইডিয়া!

আমাদের বিভাগের একজন প্রফেসর বলেছিলেন, 'তুমি জিতে গেলে জিতে যাবে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়। আর হারলে পরাজয় আমাদের সবার।' যখনই কোনো দেশীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি, আমরা এই কথাটা মনে রাখতাম। জীবনের সবটুকু রং দিয়ে সাজিয়ে নাও এই বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন। রঙের খেলা খেলতে খেলতেই যার শুরু, পাঁচ বছর পর র‍্যাগ 'ডে'-তে সেই রঙের খেলা খেলতে খেলতেই সাঙ্গ হবে এই স্বপ্নিল সময়। তখন পেছনে ফিরে তাকিয়ে যেন আক্ষেপ করতে না হয়। তোমার বুকজুড়ে যেন থাকে তরতাজা আত্মবিশ্বাস।

ভালো থেকো, ভালোবেসো, ভালো রেখো।

একজন শিক্ষকের অভিজ্ঞতা

নাজনীন জামান
৪৫ তম ব্যাচ, বি এড
আই.ডি: ১৭২০১০৩০১০০৭

আমার শিক্ষকতার পেশার হাতে খড়ি হয় কুমিল্লা সেনানিবাসে অবস্থিত ''Mainamati English Medium School'' এ। আমি প্রথম যেদিন স্কুলে যোগদান করতে গেলাম সেদিনই আমাকে Std -1 এর English II বিষয়ের শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হলো, যেটি ছিল স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্টু বাচ্চাদের একটি শ্রেণী কক্ষ। শ্রেনীটি ছিল ২৮জন শিক্ষার্থীর সমষ্টি এবং অধিকাংশ শিক্ষকেরাই এই Std -1 এর ক্লাস নিতে অনীহা প্রকাশ করতো কারণ অধিকাংশ বাচ্চাগুলোই এত বেশি দুষ্টু ছিল যে, কোনভাবেই শ্রেণী শৃঙ্খলা বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে পাঠদান করা সম্ভবপর ছিল না। শিক্ষক হিসাবে প্রথম কর্মজীবনে আমি যখন সেই ক্লাসটিতে পাঠদানের জন্য প্রবেশ করলাম তখন আমি একেবারেই দিশেহারা হয়ে পড়লাম। কারণ, একদিকে যেমন আমার কোন পেশাগত অভিজ্ঞতা বা ট্রেনিং ছিল না অন্যদিকে তেমন অন্যান্য শিক্ষকদের নিকট থেকে শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে পূর্ব ধারণা লাভ করে কিছুটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

যাই হোক, ক্লাস রুটিনের নির্ধারিত ৪০ মিনিট সময়ের মধ্যে আমার ঐ ক্লাস একটা মুহূর্তের জন্যও শান্ত ছিল না। এতটাই গোলমালপূর্ণ ছিল যে, পাশ্ববর্তী শ্রেণী কক্ষে পাঠদানে যে অনেক সমস্যা হচ্ছিল এটা আমি অনুধাবন করতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমার সহকর্মীরা বিষয়টিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছিলেন কারণ তারা জানতেন আমি শিক্ষক হিসাবে যতটা নতুন তারা শিক্ষার্থী হিসাবে ততটা দুষ্ট। অতঃপর আমি খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়লাম কর্মজীবনের প্রথমদিনে এতো বড় একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে। বাসায় গিয়ে সারাটা রাত ঘুমোতে পারলাম না।

শুধুমাত্র দুশ্চিন্তার কারণে কীভাবে আমি ওদেরকে Manage করব? কীভাবে আমি ওদের কাছে প্রিয় শিক্ষক হয়ে উঠব? পরবর্তী দিনও একই রকম পরিস্থিতিতে পড়লাম। তৃতীয় দিনে কোন কিছু ভেবে না পেয়ে Vice Principal এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাঁকে অনুরোধ করলাম যে আমার পরিবর্তে কোন দক্ষ বা অভিজ্ঞ শিক্ষককে দিয়ে এরকম ক্লাস পরিচালনা করার জন্য। কিন্তু কোন কাজই হলো না। বরং তিনি আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, ''এই সমস্যাটাকে আমার শিক্ষকতা জীবনের অগ্নি-পরীক্ষা হিসাবে ধরে নিতে এবং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে যে অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করব সেই অর্জিত অভিজ্ঞতা আমার শিক্ষকতা পেশায় সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে বড় পাথেয় হয়ে থাকবে।''

যাই হোক, খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলাম এই চ্যালেঞ্জ আমাকে গ্রহণ করতে হবে, ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলে চলবে না, যেভাবেই হোক তাদের কাছে আমাকে প্রিয় পাত্র হয়ে উঠতে হবে। পরবর্তী ৩/৪ টি ক্লাসের মধ্যেই আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে তারা গল্প শুনতে খুবই আগ্রহী এবং শিক্ষকের সাজ-গোজ ও পোষাক-পরিচ্ছেদে তারা আকৃষ্ট হয়। শিক্ষকেরা

সবাই সাধারনতঃ থ্রি পিছ পরে যেত কিন্তু আমি নিজেকে তাদের সামনে বিশেষায়িত করার জন্য থ্রি-পিছের পরিবর্তে শাড়ী পড়ে নিজেকে সব সময় পরিপাটি করে রাখতাম। এটা তাদেরকে এতো বেশি আকৃষ্ট করল যে, তারা খুশি হয়ে মাঝে মাঝে আমাকে ফুল উপহার দিত খোপায় পরার জন্য।

এছাড়াও ক্লাসে কিছুটা সময় গল্প শুনিয়ে তাদেরকে Warm Up করার জন্য গোপাল ভাঁড়ের একটি হাস্যকর গল্পের বই কিনে এনে তা থেকে ১৯টি গল্প নির্বাচন করে আয়ত্ত করলাম। কারণ, একাডেমিক ক্যালেন্ডারে ঐ ক্লাসে আর মাত্র ১৯টি ক্লাস পাওয়ার কথা ছিল। প্রতিদিন আমি নির্ধারিত ৪০ মিনিট ক্লাসের মধ্যে ৩০ মিনিট পাঠদান করতাম এবং বাকী ১০ মিনিট গোপাল ভাঁড়ের গল্প শোনানোর জন্য ব্যয় করতাম। এতো অল্প সময়ের মধ্যে আমি অতি বেশি সুফল পেতে শুরু করলাম যে, গল্প শোনার জন্য তারা দ্রুত তাদের শিখন কার্যাবলী সম্পন্ন করতো এবং পাঠে খুব বেশি মনোযোগী থাকত। মাত্র একমাস এভাবে চলতে লাগল এবং এই এক মাসের মধ্যেই আমি তাদের কাছে এতো প্রিয় শিক্ষক হয়ে উঠলাম যে, ঐ গোলমালপূর্ণ শ্রেনী কক্ষটিতে পাঠদানের সময় Pin Drop Silence বজায় থাকত। আমার সাথে শিক্ষর্থীদের এই বন্ধুত্বপুর্ণ সু-সম্পর্ক দেখে ছয় মাসের মধ্যে Vice Principal আমাকে ঐ ক্লাসের Class Teacher হিসাবে নিয়োগ দিলেন। মাত্র দেড় বছর আমি ঐ শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষক হিসাবে থাকতে পেরেছিলাম। কারণ, আমার স্বামীর ঢাকায় বদলি হয়ে আসার কারণে আমাকে স্কুলটি ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু অল্প সময়ের জন্য হলেও আমার শিক্ষকতা পেশার ঝুড়িতে জমেছিল অনেক মধুর স্মৃতি, যা আজও আমার কাছে অম্লান হয়ে আছে ।

আজও দশ বছর পরে সেই Vice Principal Mam এর কথা মনে পড়ে। যিনি আমাকে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে উৎসাহিত করেছিলেন। ঐ শিক্ষার্থীদের সাথে অতিবাহিত দিনগুলোতে যে অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি তা আমাকে এই পেশায় আরও অনেক বেশি আত্নবিশ্বাসী করে তুলেছে। শিক্ষক হিসাবে আমার উপলব্ধি শুধু এতটুকুই-সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি প্রকৃতির ঐ কোমলমতি শিশুরা (শিক্ষার্থীরা Std -1) এতটাই কোমল যে বাস্তবতার কাঠিন্য থেকে অনেক দূরে হাস্যকর কল্পনার জগতে বাস করতেই তারা পছন্দ করে, তাইতো তারা প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধির পরিবর্তে গোপাল ভাঁড়ের মতো হাস্যকর গল্পে অনেক মজা পায়। শিক্ষককে তারা এতটাই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মনে করে যে শিক্ষকের নিজেকে বিশেষভাবে উপস্থাপনের প্রতি তারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় যায় ফলশ্রুতিতে তাদের আচরণে কাঙ্খিত পরিবর্তন আসে।

আমার স্মৃতিতে
একজন বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাঃ প্রেক্ষাপট

মীর আহমেদ হুসাইন (হাসান)
৪৫তম ব্যাচ, এলএলএম
আই.ডি: ১৭২০৫০১০৪০১০

২১শে অগাস্ট, ১৯৭১ ভোর ৯ টায়, আমি নিয়মিত উর্দু পত্রিকা 'জং' দেখি, ঐদিন সেই পত্রিকায় সবচেয়ে বড় খবরের শিরোনাম ছিল যে, করাচীর পাশে ছোটো শহর বজ্রপাতে একটি বিমান দুর্ঘটনা ঘটে। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি এবং সাধারণ দুর্ঘটনা মনে করেছিলাম, কিন্তু যখন দেখি পত্রিকায় লেখা "একজন বাঙালী মুক্তি যোদ্ধা (পাকিস্তানীদের মতো গাদ্দার) ব্যাপারে" এবং আমি অতি উৎসাহে সম্পূর্ণ খবর পড়ি (তখন আমি উর্দু পড়তে ও লিখতে পারতাম) সেই পত্রিকায় লেখাছিল" একজন বাঙালী মুক্তিযোদ্ধার নাপাক পরিকল্পনাকে একজন শিক্ষানবিশ বৈমানিক (পাইলট) নৎসাত করে দিয়েছেন ও বিমানটিকে ভারতে নানিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিলেন অর্থাৎ শাহাদাত বরণ করলেন এবং সাথে সাথে দেশের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান দেশের সবোর্চ্চ সম্মাননা "নিশান -এ-হায়দার" উপাধি দিয়ে ভূষিত করলেন, তখন আমার মনে পড়লো যে আগের দিন অর্থাৎ ২০আগস্ট, ১৯৭১ এর কথা, দুপুর তিনটা, বিকাল পাঁচটা এবং রাত ৮টা PTV (পিটিভি) বাংলা খবরে প্রচার হয়েছিল এ বিষয়ে, কিন্তু আমি অনেক ছোট ছিলাম এবং খবরটাকে এত গুরুত্ব দেইনি, এবং কিছু বুঝে উঠতে পারিনি, কিন্তু আশে পাশের লোকদের কথা এবং এ ব্যাপারে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিলো, যখন পত্রিকা "RvsM" তে খবর পড়ি তখন সব কিছু আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। পত্রিকায় আরো লেখা ছিল যে" উভয়ই বৈমানিকদের মধ্যে দীর্ঘ এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বিমান নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি হয় এবং উভয়ে নিজের জীবন বাজি রেখে প্রশিক্ষণ বিমান T-33 কে দখলে নেওয়ার জন্য চেষ্টা চালায়। রাশেদ মিনহাজ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (ControlTower) থেকে নির্দেশনা পাচ্ছেন যে, বিমানটিকে দখলে রাখতে এবং কোন কারণে না পারলে বিমানটিকে যাতে ধ্বংস করে দেয়, কোন ক্রমে মতিউর রহমান, বর্ডার অতিক্রম করতে না পারে, পরবর্তীতে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান ও চেয়েছিলেন যে যদি তিনি বিমানটিকে নিজের দখলে নিতে না পারেন তাহলে তার ইচ্ছে ছিল যে বিমান ধ্বংস হয়ে যাক এবং তাই হয়েছে। অতএব এ ধস্তাধস্তিতে মতিউর রহমান অনেক উপর থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং রাশেদ মিনহাজ বিমান নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে বিমান ক্রাশ অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যায় এবং রাশেদ মিনহাজ বিমানের ভেতরে মারা যায় এবং মতিউর রহমানের লাশ বিমান থেকে আধা কিলোমিটার দূরে পাওয়া যায়। সেখান থেকে বর্ডার মাত্র পয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে ছিল। এই খবর পড়ার সাথে সাথে আমি বাড়ির অন্যান্য লোকের সাথে এই ব্যাপারে কথা বলি এবং শুনলাম যে PTV এই ব্যাপারে সংবাদ প্রচার হচ্ছে এবং আমি পরবর্তীতে টিভি খুলে নিশ্চিত হই, যে পত্রিকার সংবাদটি সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য পরে আমি সকাল এগারটার দিকে নার্সারি বাজারে যাই এবং দেখি যে যেখানে অনেক হৈইচৈই তো সেখানে একটা নীরবতা বিরাজ করছিল এবং কেউ কারোর সাথে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলছিল না। পরবর্তীতে আমি জানতে পারলাম যে, মতিউর রহমানের লাশ অনেক সময় ধরে সেখানে পড়েছিল এবং কর্তৃপক্ষ পরিবারের কাউকে লাশের কাছে যেতে দেয় না। তার লাশকে অনেক অমর্যাদা সহিত তাকে নর্থ নাজেমাবাদ করাচী শহরে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী কবরস্থানে দাফন

করা হয়। আমি এবং সেখানকার বাঙালি সম্প্রদায় মতিউর রহমানের এই সাহসিকতা উপলব্ধি করলাম যে, সবাইতো নিজের দেশের মাটিতে থেকে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, কিন্তু আমার জানা মতে শত্রুর মাটিতে তিনি একজনই যিনি সাহসিকতার সহিত মুক্তিযুদ্ধ করার বিরাট সাহস দেখিয়েছিলেন, তখন তিনি নিজের দেশের স্বার্থটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন কোন কিছু বাধা বিপত্তিকে পাত্তা দেননি। এবং আমার মনে হয়েছিল যে, তিনি নিশ্চিত জানতেন যে, করাচীর মাটি থেকে কোন প্রকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করাটা শুধু নিজের জীবনকে বিপন্ন করা ছিলনা, সাথে সাথে তার পরিবারেরও জীবন বিপন্ন করা। কিন্তু কোন বাধা বিপত্তি তাকে আটকে রাখতে পারেনি এবং বীরের মত নিজের জীবন নিজেই উৎসর্গ করলেন, মতিউর রহমানের শাহাদাতের পরে তার পরিবারে নেমে আসে সীমাহীন যন্ত্রণা এবং দুর্দশা সেই সময়ে আমি মুখে মুখে শুনেছি এবং উপলব্ধি করেছি যে, তার স্ত্রী, সন্তানদের অনেক অমর্যাদা পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ ও বিমান অফিসাররা করেছিলেন। এই ঘটনার পর আমি করাচীতে থেকে অনুভব করলাম যে, তারা অর্থাৎ পাকিস্তানীরা বিশ্বাস করতে লাগলো যে, তারা মুক্তি যুদ্ধকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এই দুর্দান্ত ঘটনার পর পাকিস্তানে বসবাসরত পূর্বপাকিস্তানীদের অর্থাৎ বাঙ্গালীদের সন্দেহ করে, বিশ্বাস করে না এবং বাঙ্গালীদের অসম্মান করে কথা বলে এবং বাঙ্গালীদের সাথে পাকিস্তানীরা অমানবিক ব্যবহার শুরু করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কে গাদ্দার উপাধি দেয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায় এবং কোন কারণে আমাকে সেখানেই থাকতে হলো। কিন্তু এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো যে, আমি কোন স্কুলে লেখাপড়া করতে পারলাম না, কারণ তখন পূর্বপাকিস্তান স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ হয়ে গেল এবং বাঙ্গালীরা তাদের চোখে গাদ্দার হয়ে গেল আমি পরবর্তীতে ১৯৭২-৭৩ সালে "হ্যাপী হোমস নামে স্কুলে ভর্তি হতে যাই, যা করাচীর "শাহিদ-এ-মিলাদ" রোডে অবস্থিত ছিল, কিন্তু বাঙালী হওয়ার কারণে তারা আমাকে ভর্তি করলো না।

পরবর্তীতে আমি পরিচয় গোপন করে ১৯৭৭ সালে করাচী বোর্ড থেকে প্রাইভেটে এস,এস,সি অর্থাৎ (Metriculation) পরীক্ষা পাশ করি। পরে, গভর্মেন্ট ন্যাশনাল কলেজ থেকে এইচ,এস,সি পাশকরি ১৯৭৯ সালে করাচী বোর্ড থেকে এবং ঐ বছর করাচী ইউনিভার্সিটিতে বি,কম এ ভর্তি হই এবং পড়ালেখা শেষ না করে জানুয়ারি ১৯৮০ সালে পাকিস্তান ত্যাগ করি।

উপসংহারে, আমি এই বলতে পারি যে, সবাই তা নিজ দেশে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান বিদেশে ও শত্রুর মাটিতে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এবং অত্যন্ত ঝুঁকি ও রিস্ক নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

বাবু স্যার বিএড, এমএড

কাজী তৌহিদ ইলাহী
৪৬তম ব্যাচ, বিএড
আই ডি ঃ ১৭৩০১০৩০১০০৩

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির এক জনপ্রিয় স্যার। সাদাসিদে সদা হাস্যজ্জল পরিশ্রমী এবং বন্ধুত্ব পরায়ন। স্যারের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য ভাল হলেও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নিয়ে সবার একটু দ্বিধা রয়েছে। ভাগ্যিস চাকুরির সময় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর ছাড়পত্র ইউনিভার্সিটির নিয়োগ কর্তারা চায়নি! এবার আমরা বাবু স্যারের কিছু ঘটনা/ দুর্ঘটনা সর্ম্পকে অবগত হবো-

১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আর মাত্র ৭দিন বাকি। বাবু স্যারের এক বড়ভাই তার এবং তার বন্ধুর জন্য ২টি ইংল্যান্ডের তৈরী কালো প্যান্ট পিছ পাঠিয়েছে। এয়ারপোর্টে ব্যাপার সবারই জানা, গেলো তো গেলো বাবু স্যারের পিছটি খোয়া গেল। স্যারের খুব মন খারাপ, আর মাত্র ৩দিন বাকি এখনো প্যান্টই তৈরী হয়নি। বন্ধু বলল "চল! টেইলরের কাছে যাই সমাধানতো করতেই হবে। বাবু স্যার দুঃখের কথা মাস্টারকে খুলে বলতেই মাস্টার দুইজনের মাপ নিলো এবং বললো, "কোন চিন্তা করবেন না, এটা দিয়ে আমি ২ পিছ প্যান্ট বানাতে পারবো। বাবু স্যার ও তার বন্ধুর বিশ্বাসই হচ্ছে না। ২দিন পর স্যার ও তার বন্ধু আসলো, দুজন প্যান্ট পরে ট্রায়াল দিল, সব ঠিক আছে। বাবু স্যার জানতে চাইলো কিভাবে সম্ভব হলো? মাস্টার বললো, "শোনেন, সোয়া গজ কাপড়ের ১গজ দিয়ে আপনার বন্ধুর প্যান্ট বানালাম অনেক কষ্ট করে, তারপর বাকী কাপড় দিয়ে আপনার প্যান্ট খুব আরামে বানালাম তারপরও দেখি কিছু কাপড় বাচঁলো, সেটা দিয়ে ১টা রুমালও বানালাম এই নেন।"

২) ইউনিভার্সিটিতে আসার জন্য বাবু স্যার ডাইরেক্ট মিরপুরের বাসে উঠে পিছনের ৫সিটে গিয়ে আরো ৪ জনের সাথে বসলেন। বাস কন্ডাক্টর আবারো বলতে লাগলো, "পিছনে আর ১জন, ডাইরেক্ট মিরপুর।" পিছনের সিটের ১জন যাত্রী রেগে বললো, "সীটতো খালি নাই, পিছনে ৫জন হয়েছে, গেইট লক কর।"কন্ডাক্টর বললো, "ভাই দেখেন বাবু স্যারের পাশে এখনো এক হাত জায়গা খালি। এই আর ১জন, ডাইরেক্ট মিরপুর।"

৩) ট্রাফিক জ্যামে পড়ে রাস্তায় দেরি হয়ে গেল। সকাল ৮:৩০ মিনিটে ক্লাস, বাজে ৮:৪০ মিনিট। বাবু স্যার হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন লিফট্ এর কাছে। এসে দেখলেন লম্বা লাইন প্রায় ৪০জন অপেক্ষা করছে। উঠতে হবে ৮ম তলায়। ১০০০ কেজি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন লিফটে ১৫জন উঠেছে। রেজিষ্ট্রার স্যার উঠলেন। এলার্ম বেজে উঠলো! স্যার নেমে গেলেন। লাইনে ৫ বছরের একটি বাচ্চা ছিল। রেজিষ্ট্রার স্যার তাকে উঠালেন এলার্ম বেজে উঠলো! বাচ্চাটি নেমে গেল। বাবু স্যার হন্তদন্ত হয়ে লিফটে উঠলেন। লিফটের দরজা বন্ধ হল, লিফট্ উপরে উঠে গেল কোন এলার্ম বেজে উঠলো না!!!

৪) বাবু স্যার হোটেলে যাচ্ছেন সকালের নাস্তা করার জন্য, পথে ভার্সিটির পুরানো এক বন্ধুর

সাথে দেখা। বাবু স্যার তাকেও নাস্তা করাবেন, কিন্তু বন্ধু নাস্তা করেই বের হয়েছে কিছুই খাবে না, পেটে কোন খালি জায়গা নেই। বাবু স্যার জোর করে তাকে হোটেলে ঢুকালেন। আগেই বলা ভাল স্যারের বন্ধুর স্বাস্থ্য স্যারের ঠিক বিপরীত, জাপানের সুমো কুস্তিগীরদের মতো। বাবু স্যার বেয়ারাকে ডাকলেন, "শোন! এর জন্য ১টা পরোটা আর হাফ বুটের ডাল, আর আমার জন্য ৩টা পরোটা, ১টা ডাল, ১টা সবজি, ১টা হালুয়া। বেয়ারা কিছুক্ষণ পর স্যারের বন্ধুর সামনে দিল ৩টা পরোটা, ১টা ডাল, ১টা সবজি, ১টা হালুয়া আর স্যারের সামনে দিল ১টা পরোটা আর হাফ বুটের ডাল। বাবু স্যার রেগে বেয়ারাকে আবার ডাকলেন, কি বললাম আর কি করলা? আমাকে ১টা পরোটা আর হাফ বুটের ডাল কেন দিলা? বেয়ারা বললো, স্যার, আগে খাইয়া লন, লাগলে আরো দিমু।

৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ বিভাগের খেলা চলছে। ছেলেদের ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় বাবু স্যার দৌড় থামাতে না পেরে সোজা গ্যালারীতে উঠে পড়লেন। আই,ই,আর এর দুইজন প্রফেসর গ্যালারীতে উঠে বাবু স্যারকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এসে গোল্ড মেডেল পরিয়ে দিল। চারিদিকে হাততালি। বাবু! বাবু!! বাবু!!! বাবু স্যার অবাক হয়ে দেখছেন কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছেন না। এক সাংবাদিক এসে বাবু স্যারকে প্রশ্ন করলো, "১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় আপনি ফার্স্ট হয়েছেন কিভাবে?" বাবু স্যার বললেন, কার্জন হলের গেইটের সামনে থেকে একটা চিকেন ফ্রাই হাতে নিয়ে খেলার মাঠে ঢুকছিলাম খেলা দেখার জন্য, রাস্তা থেকে একটা পাগলা কুকুর দিল ধাওয়া, আমি প্রাণ বাঁচাতে খেলার মাঠ দিয়ে দৌড়ে সোজা গ্যালারীতে গিয়ে উঠলাম এরপর দেখি গলায় এই মেডেল।"

৬) পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে কোমরে বেল্টবিহীন প্যান্ট রাখা একটু কষ্টকর হচ্ছিল। তাই বাবু স্যার শপিংমলে গেলেন বেল্ট কিনতে। জেন্টস্ কর্নারে বেল্ট এর সারিতে গিয়ে সেলস্ ম্যানকে বললেন, "আমার মাপের একটা বেল্ট দেখান ভাই।" সেল্স ম্যান ভাল করে দেখে বললো, "স্যার একটু দয়া করে কিডস্ কর্নারে যান আপনার মাপেরটা পেয়ে যাবেন।" বাবু স্যারের বেল্ট কিনতেই হবে। তাই সোজা চলে গেলেন কিডস্ কর্নারে, কেউতো আর জানবে না কোথা থেকে বেল্ট কেনা হয়েছে। সেল্স ম্যানকে আস্তে বললেন, "আমার মাপের একটা বেল্ট দেখান ভাই।" সেলস্ ম্যান ভাল করে দেখে বললো, "স্যার, এই সাইজের বেল্ট আমাদের কোম্পানি এখনো তৈরী করেনি। তবে আপনি মাপটি দিয়ে গেলে আমরা আমাদের কোম্পানির পরবর্তী এ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং (এ,জি,এম) এ পাশ করার চেষ্টা করবো। আপনি ১ বছর পর যোগাযোগ করবেন।"

সিনেমা রিভিউ

His Judgement Cometh and Right Soon...

A Review of 1994 Movie: *The Shawshank Redemption*

Nazmul Hassan
37th Batch, BA (Hons) in English
ID: 143010101003

Adapted from Stephen King's novella "Rita Hayworth and Shawshank Redemption" (1982), director Frank Darabont made one of the most influential movies of the late twentieth century. The story is of a banker Andy Dufresne, who is accused of murdering his wife and her lover. Though only he knows that he did not murder them, he is sentenced two consecutive life terms in the New England state prison named Shawshank. In Shawshank, he befriends with 'Red' Redding who smuggles things from outside of the prison. The movie is centered these two persons while other minor characters appear.

After watching the movie, I wondered, "Why haven't I watched this great movie all these years?" It's not just a movie of freedom; it's a movie of an innocent person, movie of hope, of the doom of evil. I haven't either read Stephen King's novella or previously known to the plot of the movie. While watching, it seems that Andy will somehow escape from the prison. There are so many clues in the movie that Andy will escape, but how will he manage to do it that is unknown. At one point when Andy gets the chance to re-shape the prison library he mentions the French novelist Alexandre Dumas' masterpiece *The Count of Monte Cristo* and how the protagonist of that novel, Edmund Dantes escapes the prison. It is assumable that either Stephen King or director Frank Darabont is inspired by the French novel.

The taste of freedom! Everyone who hears about Andy's plan to escape the prison laughs at him. When Andy manages a rock hammer from Red, Red tells him that it would take 600 years for a man to make a tunnel through the prison wall and mocks at him. Who knows Red will be proved wrong? Who knows Andy will follow what did the priest in *The*

Count of Monte Cristo? Who knows Andy will not be failed like the priest? Andy makes it because he has hope; he has the courage and knows that he is innocent. Andy's willpower makes him so silent throughout the movie, but the inner Andy? Inner Andy is not silent, he is free, and he is free to roam in his own mind. While other think Andy makes himself adapted with the condition of the prison but who knows he has "a plan"?

The warden Norton, who becomes a fan of Andy and uses him like his employee, always seems to be a religious man and keeps a copy of the Holy Bible. His characterization is that of corrupting religious person, an impostor who shows his obligation to law and justice but violates it in gentle way. He is the symbol of abusing bestowed power and authority. When he first meets Andy in the prison while checking the prisoner's room he finds a copy of the Bible in Andy's prison room. Andy tells warden that his favorite line from the Bible is *"Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh"*. But who knows Andy puts an irony here. Later, Andy becomes a popular person among the prison officials and fixed the tax information and does money laundering for them as previously he was a banker. He keeps Norton's tax information, which is mostly illegal, in a vault on the wall in warden's office. The vault is hidden under a wall mat which reads, **"His Judgement Cometh and Right Soon..."**

Andy finally makes it possible to escape Shawshank and puts his Bible in warden's vault instead of the notebook in which tax and bank information of the warden is written down. He escapes with warden's notebook, the precious one. Andy shows in his attitude throughout the whole movie that he is innocent and he escapes from the prison with dignity and to live a better life. At one point in the movie Red says, "Some birds are not meant to be caged..." and Andy is that kind of bird who wants to break the cage.

What that is done to Andy by the Court is not justice, it's just spreading the propaganda and making an innocent man guilty. The judgement

finally comes when warden commits suicide and some corrupt officials of the prison get arrested. God's judgement is above others and there is none to stop that. When divine judgement comes earthly conspiracy is doomed.

Morgan Freeman, who portrays the character Red and narrates the events of the movie and Tim Robbins who portrays the character Andy Dufresne played excellent. I have not watched any other movie of Tim Robbins but watched a lot of movies played by Morgan Freeman and I can say that *The Shawshank Redemption* is one of the best movies of Morgan Freeman. Andy's character would be more perfect if it was played by Tom Hanks. The movie was nominated for seven Academy Award (s) though. Darabont, the director felt the turning point for the film's success was the Academy Award nominations, saying *"Nobody had heard of the movie, and that year on the Oscar broadcast, they were mentioning this movie seven times"*. Stephen King's stories always give twist and to enjoy the twist of this movie one must watch it or must read the novella. One must watch the movie to see the patience and willpower of Andy and how he escapes Shawshank just after nineteen years of his imprisonment where Red thinks it would take 600 years.

ভ্রমণ কাহিনী

আমরা চার জন

মোঃ খালিদ হুসাইন
৪৭তম ব্যাচ, বিএসসি, ইইই
আই.ডিঃ ১৮১০৩০৩০১০৩৫

ভ্রমণ করতে কে না ভালবাসে ? কিন্তু এ ভ্রমণ হয় যদি পায়ে হেঁটে বা বাই সাইকেল যোগে, তা আর কে পছন্দ করবে না হয়ত এ যুগে পৃথিবীতে বেশ আগে পা গাড়িই ছিল ভ্রমণের একমাত্র যান । কিন্তু বর্তমানে পা গাড়িতে চললে লোকে ভাবে কৃপণ অথবা যানে চড়ার মত অর্থ নেই। কিন্তু এ মানুষই এক সময় পা গাড়িতে চড়ে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছে, আর আজ তারা এতে পিছপা এতে!

রোভার স্কাউটদের জন্য পায়ে হেঁটে ১০০ মাইল বা বাই সাইকেল চড়ে ৪০০ মাইল পথ বিশেষ নিয়মে ভ্রমণ করে পরিভ্রমণ ব্যাজ অর্জন করা প্রশিক্ষণ স্তরে বাধ্যতামূলক, যদি নাকি সে পরবর্তি ধাপ অর্থাৎ সেবা স্তরে উত্তীর্ণ হতে চায়, লক্ষস্থল হয় "প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট এ্যাওয়ার্ড" অর্জন। আর এ কাজ সাধারণ ছাত্র বা মানুষের পক্ষে কল্পনীয় নয়, দুঃসাধ্যও বটে। কিন্তু কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপের পক্ষে এই প্রথম আমরা চার জন উদ্দীপ্ত তরুণ রোভার স্কাউট ১৬১ কিঃমিঃ পথ পায়ে হেঁটে নির্দিষ্ট নিয়মে ভ্রমণ করতে সংকল্পবদ্ধ হই। প্রথমে সাধারণ যাকে এ কথা বলেছি সেই বলেছে পাগল হয়েছ নাকি ? আবার প্রস্তুতি পর্বেও ছিল প্রচুর বাঁধা-বিপত্তি। কিন্তু আমরা সকল বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে যাত্রার দিন ধার্য ও সব প্রস্তুতি শেষ করলাম। এ কাজে আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি প্রশাসনিক সাহায্য ও সাহস যুগিয়েছেন তৎকালিন কুষ্টিয়ার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জনাব সরকার আবুল কালাম আজাদ, যাঁর প্রেরণাতে আমরা এ দুঃসাহসী অভিযানে সফল হই। তিনি আমাদেরকে প্রস্তুতিপর্বে তাঁর কার্যালয়ে ও বাস ভবনে পর্যাপ্ত সময় ও পরামর্শ দিয়েছেন, যা আমাদের কাজকে সহজ করে দিয়েছে।

অবশেষে ১৮ কার্তিক, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, ২ নভেম্বর, ২০০৮ খ্রীস্টাব্দ রোজ রবিবার হেমন্তের শিউলি ভেজা এক প্রভাতে আমাদের পদযাত্রা শুরু হল। যাত্রাপথে প্রথম বিরতি ছিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে । ওখানে পৌছে দেখি ওখানের রোভারেরা ও সম্মানিত প্রফেসরগণ আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে আমাদের পথ চেয়ে অপেক্ষা করছেন, এ দারুণ এক অনুভূতি । প্রথম দিনের যাত্রা শেষ হল শৈলকুপায়। ওখানের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আমাদের যাত্রার সংবাদ পেয়ে কাজ ফেলে ঢাকা থেকে এসে হাজির, আর কত আয়োজন। আবার কিছুক্ষণ পরেই শৈলকুপা প্রেসক্লাবে পেলাম বিশাল সংবর্ধনা, করলাম সংবাদ সম্মেলনও। দ্বিতীয় দিন প্রথম প্রহরে প্রথম যাত্রা বিরতি ছিল ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে। ওখানে পৌছতেই দেখি আমাদের সংবর্ধনা জানাতে লোকজন হাজির। মতবিনিময় করলাম ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অ্যাডজুটেন্ট মেজর মোঃ মাহবুবুর রহমান এর সাথে। ওখান থেকে আমরা

চললাম ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কাছে। গিয়ে দেখি তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি অন্যদের বসিয়ে রেখে আমাদরকে সময় দিলেন, এ আমাদের জীবনে পরম পাওয়া। কই সাধারণ ছাত্ররা তো এমন মর্যাদা পায় না। অপরাহ্নে আমরা পৌছলাম কালিগঞ্জে, ওখানের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাত করার কথা। আমাদের উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে তিনি একটি বিশেষ সভার সময় পিছিয়ে আমাদের সাথে কুশল বিনিময় ও অনুপ্রাণিত করলেন।

তৃতীয় দিন পূর্বাহ্নে যশোর এম. এম. কলেজে পৌছে দেখি এক এলাহী কান্ড। আমাদের যাত্রার সংবাদ পেয়ে যশোর পুলেরহাটের এ.এফ.সি মাহফুজা আপুও এসে হাজির আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে। ওখানকার সকল রোভার, গার্লস-ইন-রোভার সমবেত আমাদের সংবর্ধনা দিতে। তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে প্রবেশপথে, প্রদর্শন করল গার্ড অব অনার। তারা আমাদের ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করল, আমাদের ফ্রেশ হওয়ার জন্য পানি, নাস্তার জন্য ডাব, কলা, আপেল, কেক, সিঙ্গারা আরও কত কি নিয়ে প্রস্তুত তারা। আবার দুপুরের খাবারের জন্য এক বিশাল আয়োজন, এ যেন জামাই আদর। সে এক অসাধারণ অনুভূতি। সময় যতই গড়াচ্ছে আমাদের শারীরিক শক্তি হ্রাস পাচ্ছে, কিন্তু এ সংবর্ধনাগুলো নিমিষেই সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিচ্ছে, মানসিক শক্তিকে করছে আরও দৃঢ়, যোগাচ্ছে বাকি পথ চলার শক্তিও। তৃতীয় দিনের শেষ প্রহর ছিল খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন আমাদের পদযাত্রার। ঐ দিনের গন্তব্য স্থল ও পূর্ব নির্ধারিত রাত্রীযাপনের প্রতিষ্ঠানটি গিয়ে দেখি বন্ধ বেশ কিছু দিন ধরে, ক্লান্ত শরীরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম আমরা। দলনেতা হিসেবে আমাকেই তাৎক্ষণিকভাবে তা মোকাবিলাও করতে হলো । আর এরই ফলস্রুতিতে অতিক্রান্ত হল অভিজ্ঞতার এক তিক্ত অধ্যায়।

চতুর্থ দিনের যাত্রা শেষ করলাম খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং রাত্রীযাপন করলাম ফুলতলা উপজেলা ডাকবাংলোতে। ওখান থেকে পঞ্চম দিনের প্রভাতে যাত্রা শুরু করলাম খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে। আমরা যখন খুলনা প্রকৌশল বিশ্বদ্যিালয়ের প্রধান ফটকে পৌছলাম তখন গেটম্যান আমাদের বলল আপনাদের জন্য ভিসি স্যার অপেক্ষা করছেন। প্রধান ফটক পার হয়ে অনেকগুলো ভবন পার করে ভিসি স্যারের ভবনে পৌছলাম আমরা। ওখানে আমাদের বরণ করতে অপেক্ষা করছিল ভিসি স্যারের কর্মচারীবৃন্দ, তারাও বলল আপনাদের জন্য ভিসি স্যার অপেক্ষা করছেন অনেকক্ষণ ধরে। তারা আমাদেরকে ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের কক্ষে নিয়ে গেল। তিনি আমাদেরকে পেয়ে রোভারিং কার্যক্রম এবং আমাদের ইন্সটিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তারপর তা নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করলেন। তিনি ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের দেশ গঠনে ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে বললেন "দেশের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে ডিপ্লোমা প্রকৌশলী। কোন দেশকে উন্নত করতে হলে প্রথম প্রয়োজন কারিগরী দিক তথা প্রকৌশলী ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, যার মূলে রয়েছ তোমরা। নেই তোমাদের পর্যাপ্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা, ২/৩ জন শিক্ষকের ক্লাস নিতে হয় একজন শিক্ষককে, আমাদের দেশের সরকার ও তাঁর উপদেষ্টারা তোমাদের মূল্য বোঝে না, দিতে জানে না, এটাই

সবচেয়ে দুঃখের বিষয়। আর এজন্যই আজ আমরা এতটা পিছিয়ে।" আমরা এই প্রথম কোন উঁচু মানের ব্যক্তির নিকট থেকে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের মূল্যায়ন পেতে দেখলাম। তিনি আরও বললেন তোমরা ডিপ্লোমা প্রকৌশলী আবার রোভার স্কাউটও, তোমরা এ জাতিকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে পারবে এ আমার দৃঢ় প্রত্যাশা। তাতে আমাদের মনোবল আরও বৃদ্ধি পেল, এটা আমাদের জীবনের এক চিরস্মরণীয় অধ্যায়। ওখান থেকে বিদায় নিয়ে আবার ছুটে চলা, শেষ দিনের পথ আর যেন শেষ হয় না। দলের দু'ই সহযাত্রীর পায়ের অবস্থা ক্রমশ খারাপ থেকে খারপতর হতে লাগল, ফলে পথ চলতে বাড়তি সময় লাগতে শুরু হল। তবুও আমরা সাঁঝ বেলায় নোঙ্গর ফেললাম পদযাত্রার শেষ ঘাট খুলনা বিশ্বদ্যিালয়ে। খুলনা বিশ্বদ্যিালয়ের ভিসি স্যারের সাথে সাক্ষাৎ করে আনুষ্ঠানিকভাবে পদযাত্রা শেষ করার কথা ছিল। ঐ দিন এক দুর্ঘটনায় খুলনা বিশ্বদ্যিালয়ের দুই শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয় ফলে ভারক্রান্ত হয় আমাদেরও মন। আর এরই কারণে খুলনা বিশ্বদ্যিালয়ের সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের সাথে সাক্ষাত হল না। তিনি গুরুতর আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছিলেন। কি আর করা, অবশেষে খুলনা বিশ্বদ্যিালয়ের ছাত্র বিষয়ক পরিচালক প্রফেসর মোঃ রফিকুল ইসলাম স্যারের সাথে সাক্ষাৎ করে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের পদযাত্রার সমাপ্তি করলাম। এই দু:সাহসী পদযাত্রা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন "তোমাদের এ দু:সাহসী পদযাত্রা আর বুকে লেখা শ্লোগান তরুণ প্রজন্মকে আরো উদ্দীপ্ত করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।" থাকার জায়গা হলো ছাত্রাবাসে। প্রায় নির্বিঘ্নে দু:সাহসী যাত্রার সমাপ্তি শেষে ৭নভেম্বর এর পড়ন্ত বিকেলে ফিরে এলাম আমাদের ক্যাম্পাসে। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি স্কাউট জীর্ণ পথে চলে না, তারা বিস্তীর্ণ ও আদর্শ পথ সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করে নতুন দিগন্তের। আর এটাই আমরা প্রমাণ করলাম স্বল্প রসদ নিয়ে বিশাল অভিযানের সফলতার মাধ্যমে।

সচেতনতামূলক রচনা

জোছনা হারিয়ে যাচ্ছে ...

এফ নাহিদ হক
উপ-পরিচালক
সেন্টার ফর রিসার্চ, এইচ আর ডি অ্যান্ড পাবলিকেশন্স

একবার ভাবুন তো! চারিদিকে ফক্‌ফকে জোছনা। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। ঠান্ডা হিমেল বিশুদ্ধ বাতাস। কবে, কোথায় আপনি শেষ উপভোগ করেছেন? ঐ যারা ছুটি-ছাটায় গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে জোছনা রাত পেয়ে যান তারা হয়তো উপভোগ করেন এই দৃশ্য। কিন্তু শহরে? কোথায় জোছনার আলো? চারিদিকে শুধু কৃত্রিম আলোর ঝলকানি। কী হল তবে? জোছনা কি হারিয়ে গেল? হারিকেন দিয়ে খুঁজতে হবে নাকি! হ্যাঁ, আমরা যারা শহরে বাস করি তাদের জন্য জোছনা হয়তো হারিয়েই গেছে। কিন্তু কেন? এর অন্যতম কারণ আলোক দূষণ। আমরা বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, পানি দূষণ ইত্যাদির সঙ্গে বেশ পরিচিত। আলোক দূষণও তেমনি বর্তমান সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আলোক দূষণ কী :
আলোক দূষণ হল কৃত্রিম আলোর অতিরিক্ত ও দীর্ঘক্ষণ ব্যবহার যার কারণে রাতের আকাশে উজ্জ্বলতা সৃষ্টি, নানা প্রাকৃতিক চক্রের ব্যাঘাত, মানব স্বাস্থ্যের ক্ষতি, এমনকি রাতের আকাশের তারা ও অন্যান্য গ্রহের অবলকন বা পর্যবেক্ষণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। শুধু আকাশের ক্ষেত্রেই নয় এমন অন্যান্য ক্ষেত্রেও আলোক দূষণ প্রযোজ্য যেখানে আলোর অতিরিক্ত ব্যবহার উচিত নয়।

আলোক দূষণের কয়েকটি ক্ষেত্র :
জ্বলজ্বলে রাতের আকাশ রাতের বেলা শহরের আকাশে বেশ জ্বলজ্বলে আলো থাকে। এমন জ্বলজ্বলে আভা প্রাকৃতিক কারণেও হতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কৃত্রিম আলো প্রজ্বলনের ফলে এটি দেখা যায়। এই আলো ধুলাবালি, নানা রকম গ্যাসীয় পদার্থ ও পানির ফোঁটায় মিশে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। জ্যোর্তির্বিজ্ঞানীরা এই আলোর আভায় প্রায়শঃই সমস্যায় পড়ে থাকেন যেহেতু এটি মহাশূন্যের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণে বাঁধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জানা গেছে যে, ২০১২-২০১৬ পর্যন্ত পৃথিবীর আলোক দূষণ প্রতিবছর ২% হারে পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তা-ই নয় LED আলো থেকে যে নীল আলোর নিঃসরণ হয় তা স্যাটেলাইটের আলোক সংবেদন যন্ত্রে ধরা পড়ে না।

চোখ ঝলসানো :
যখন অন্ধকারে হঠাৎ চোখে উজ্জ্বল আলো এসে পড়ে তখন চোখ ঝলসে উঠে এবং কিছুক্ষণের জন্য মানুষ কিছুই দেখতে পারে না। রাতে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির আলোতে ড্রাইভারের চোখে ঝলসে উঠতে পারে এবং দূর্ঘটনাও ঘটতে পারে। আবার গবেষণায় দেখা গেছে যারা অন্ধকারে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন তারা মোবাইল ফোন বন্ধ করার পর খুব সামান্য সময়ের জন্য চোখে কিছুই দেখতে পান না। অতিরিক্ত আলোর ব্যবহারেও রাতে এমনটি হতে পারে।

আলোর অনুপ্রবেশ :
রাতে ঘুমাতে গিয়ে প্রতিবেশীর বাড়ির উজ্জ্বল আলো বা সিকিউরিটি লাইট যদি আপনার চোখে এসে পড়ে তবে নিশ্চয়ই আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে। একইভাবে স্টেডিয়ামের আলো, বাণিজ্যিক এলাকার আলো, ইলেকট্রনিক বিজ্ঞাপনের আলো, ভোর অবধি আলোকসজ্জা ইত্যাদি আলোক দূষণ তৈরির কারণ হতে পারে।

আলোক দূষণের ক্ষতিকর দিকগুলো কী কী :
কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বুকে আলো-ছায়ার খেলা সূর্য, চন্দ্র ও তারার মাধ্যমেই চলেছে । এখন কৃত্রিম আলো কতৃত্ব নিয়েছে অন্ধকারের উপর। কেড়ে নিয়েছে শহরের জোছনা, ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে প্রকৃতির দিবা-নিশি চক্রের আর ব্যাহত হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। কৃত্রিম আলোর কয়েকটি ক্ষতিকর দিক হলো:

- পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা: উদ্ভিদ ও পশুপাখির জীবনচক্র দিন-রাত্রির উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। আলোক দূষণের ফলে তাদের খাদ্য গ্রহণ, ঘুম, প্রজনন, বেড়ে উঠা অনেক কিছুই ব্যাহত হচ্ছে। ফলে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে পরিবেশের উপর।
- মানবস্বাস্থ্যের ক্ষতি: আলোক দূষণের ফলে অনিদ্রা, মাথা ব্যথা, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা, টিউমারের স্ফীতি, স্থুলতা, বিষন্নতা মানবদেহে নানা প্রকার হরমোন (যেমন, মেলাটোনিন) নি:সরণে বাঁধা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।
- জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধি: কৃত্রিম আলো যত বেশী ব্যবহার হবে, মূল্যবান জ্বালানীর মজুদ তত দ্রুতই নি:শেষ হয়ে যাবে।
- প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন ও মহাকাশ গবেষণায় বাঁধা: বর্তমান প্রজন্ম যারা শহরে বাস করে তারা জোছনার অন্ধকারে তারার আলোর মেলা এসব সৌন্দর্য অবলোকন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এমনকি মহাকাশ গবেষণায় বাঁধার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ।

প্রতিকারের উপায়:
আশার কথা হল এই যে, আলোক দূষণ ফেরানো যায় এবং প্রত্যেকের সামান্য পদক্ষেপের পরিবর্তনে অবদান রাখতে পারে। আলোক দূষণ সম্পর্কে শুধু জেনে রাখাই যথেষ্ট নয় -- এগিয়ে আসতে হবে । আলো ব্যবহারে সচেতনতাই হতে পারে আপনার প্রথম পদক্ষেপ । আলোক দূষণ প্রতিকারের কয়েকটি উপায় হল:

- শুধু প্রয়োজনেই আলো ব্যবহার করুন বিশেষত: শূণ্য ঘর বা অফিসে বাতি নিভিয়ে রাখুন
- ঘরের বাইরের বাতির জন্য এমনভাবে শেড ব্যবহার করুন যেন আকাশের দিকে আলো না গিয়ে কেবল প্রয়োজনীয় স্থানকে আলোকিত করে
- পর্দা ব্যবহার করে বাতির আলো ঘরের ভেতরেই রাখুন
- আলোর অপব্যবহার বন্ধ করুন। যেমন: উৎসবে বাড়ি কিংবা বাণিজ্যিক এলাকায় রাতভর আলোকসজ্জা
- নিজে সচেতন হোন এবং অন্যদেরও সচেতন করুন।

মনে রাখতে হবে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষত সমাজ যদি সচেতনতার বহি:প্রকাশ না ঘটায় তবে মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদির দূষণ যেভাবে পৃথিবীর বুকে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, হয়তো আলোক দূষণও তেমনি একদিন অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে এবং আজকের শিক্ষিত সমাজকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অবহেলার কারণে অপরাধী হয়েই থাকতে হবে।

Beat Plastic Pollution

Banani Afrin
Former Lecturer, Department of Law
Prime University And Research Fellow
Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST)

World Environmental Day (WED) is the day of all people for doing something to take care of earth and the biggest yearly event for veritable environmental action. It takes place every 5th June to create awareness about importance of protecting Mother Earth, Planet and Nature. From 1972 WED has become a widely recognized day celebrated in more than 100 Countries. In the 1974 the first WED was held with the theme, 'Only one Earth'. In 1987 the idea for rotating the entire of these activities through selecting different host countries began. This year host country India got to choose the theme"Beat Plastic Pollution". As the theme for this year's edition, the world is coming together to combat single-use plastic pollution. Polyethylene is the most common and world's most popular plastic and is used to make billions of carrier bags each year. Polyethylene was first synthesized accidentally by Hans von Pechmann, in 1898 and was first industrially discovered in 1933 by Eric Fawcett and Reginald Gibson, again by accident, at the Imperial Chemical Industries (ICI) in England. Approximately the global production of polybags is around 80 million tons annually. Every year, around 500 billion Plastic bags are used worldwide. So many that over one million bags are being used every minute that are damaging our environment. Our planet is becoming increasingly contaminated by "Plastic Pollution" and by our unnecessary use of plastic carry bags. Bangladesh is one of the highest plastic consumption countries in the world.

The plastic bag might use for a good carry on but if not manage properly may find their way into the drainage system resulting into choking of drains, creating unhygienic environment and causi water borne diseases. Recycled and colored plastic bags may contain certain chemicals, which can leach to the ground and contaminate soil and sub-soil water. These

bags are very dangerous for sea life, especially those of the mammal variety. Some of the plastic bags which contain leftover food and get mixed up with other garbage are eaten by animals causing harmful effects. Plastics are non-biodegradable and impervious in nature. With an increase using of plastic bag throughout the world, the consequential effects could be actually devastating even to the human being. Bangladesh is under an alarming situation about the using of polybags and plastic.

Plastic bags should berecycledbinin every day or every week by municipalities. But these are not recycled throughout a decade! It is very alarming! Most municipalities do not burn them or store them in proper way. People are habituated to throw away polybags or plastic bottles at any place after using them. It doesn't melt down easily and is often not able to be reused from its original form.

What should we do then! There are always alternatives to plastic bags and the search for more alternatives for present and future generations. Paper bags are a possible option but they also take their toll on the environment. The use of trees to increase the production of paper products combined with the increased energy that is required to make paper bags will also have a negative environmental effect. Reusable plastic bags are being introduced to regions that want to outlaw the plastic bag altogether. These are stronger and more durable and can be used for three to five trips to the store. Of course, the reusable cloth bag is fast becoming a favorite among environmental supporters.

The need is to implement various measures to save the Earth. To protect the environmental damages the Government of Bangladesh has enacted law and imposed restriction on production, import, storage, loading, transportation etc. of hazardous waste like polybagsunder Section-6C of Bangladesh Environment Conservation Act 1995(amended 2010). If anybody violates the law he/she will be punished with imprisonment not exceeding 2 year or a fine not exceeding taka 2 lac or both(for the first offence) and in case of each subsequent offence an imprisonment for 2

years, which not exceeding 10 years or a fine taka 2 lac , not exceeding taka 10 lac or both. Usually, violations of environmental laws are handled in a civil manner, with the imposition of fines and civil damages to injured parties. But an emerging trend is spreading through the field of environmental law in favor of the enactment of state laws criminalizing environmentally destructive behavior. We have enough legal and institutional framework but there is deficiency in monitoring and observations by the concerned authority. Probably the authority sometimes get sleepy and the unconscious and dishonest businessmen are taking the advantages as a consequence we are in a revolution of using polybags like before the enactment of Bangladesh Environment Conservation Act 1995. It is requested to concern authority (Department of Environment) to take proper steps against using polybags through implementation of law as well awareness building programs to beat with plastic pollution.

Henceforth, this write-up has simply persevered to bring a plea into spotlight to make people aware of plastic pollution. What mankind must know is that human beings cannot live without Mother Earth, but the planet can live without humans. We must have to recognize that the earth has rights too.

PHOTO GALLERY

A three member delegation of Prime University on a courtesy call with the honorable President Mr Md Abdul Hamid

Chairman and Sr Vice Chairman, BOT, and Vice Chancellor visiting the UGC Chairman

A memory of 1st convocation

A memory of 2nd convocation

PHOTO GALLERY

Members of Board of Trustees at the Annual General Meeting 2017 of Board of Trustees

The Members of the Editorial Board of the Annual Magazine 'The Ray'

Prime University paying tribute to the martyrs on the Victory Day 2017

Prime University paying tribute to the language martyrs on 21.02.2018

PHOTO GALLERY

A drawing competition was held at Prime University with children of different schools on the birthday of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Prime University celebrated the Independence Day and National Day in 2018

Vice Chairman, BOT and Dean Faculty of Engineering hoisting the national flag and the flag of Prime University respectively on Independence Day 2018

Prime University mourned for the intellectual martyrs of 14th December 1971

PHOTO GALLERY

Prof Dr Md Akhtar Hossain, Member, UGC was invited to talk on UDL

Syed Abul Maksud was invited to talk on a grand seminar held at Prime University

Advocate Sultana Kamal was invited to talk on Human Rights on a grand seminar held at Prime University

Prof Dr Syed Manzoorul Islam was invited to have a talk on Post-Modernism on a grand seminar held at Prime University

PHOTO GALLERY

Md Ashraf Ali,
Sr Vice Chairman, BOT
delivering speech in the seminar
on 'Good Governance'

Kazi Reazul Hoque, Chairman, NHRCB along with Chairman and Sr Vice Chairman, BOT, Vice Chancellor, Treasurer and Registrar, PU at the freshers' reception Fall 2017 semester

PUDS members meeting the
Sr Vice Chairman, BOT
and the Vice Chancellor

Debaters of Prime University Debating Society (PUDS) at the 'International Migration Day 2017 Debate' program with BUBT debaters and respected guests

PHOTO GALLERY

A view of Prime University Cricket Team playing in Clemon Indoor Cricket Tournament

Faculty Members listening attentively during a training session

Team of IQAC of Prime University had a tour to Malaysia

Executives of Prime University with Registrar after a training session

PHOTO GALLERY

A view of quiz competition held at Prime University

A workshop on 'Post Self-Assessment Improvement Plan' was organized by Institutional Quality Assurance Cell of Prime University on 07.11.2018

The 2nd issue of The Annual Magazine 'The Ray' was uncovered

Prime University stood against the people who attacked on Prof Dr Muhammed Zafar Iqbal

PHOTO GALLERY

Prime University stood against drugs, anti-militancy, terrorism and corruption

Prime University celebrated *Pahela Baishakh*-1425

A view of 'Basanta Baran O Pitha Utshob-1424'

A bunch of foreign students at Prime University campus

PHOTO GALLERY

A view of cultural program of Annual Picnic-2018 of Prime University

Prime University arranged a *duamahfil* on the day of Eid-e-Miladunnabi

Mir Shahabuddin, Chairman, BOT delivering a historical speech on the 1st PUAA meeting

Chairman and a Member, BOT visiting pitha stall on the day of Pitha Utshab held at Prime University

... a home for rendering prime knowledge

প্রাইম ইউনিভার্সিটি
PRIME UNIVERSITY

114/116, Mazar Road, Mirpur-1, Dhaka-1216, Bangladesh
Ph: 9004993, PABX: 9004957, 8031810, Mob: 01712-675595, Fax: 9025649
info@primeuniversity.edu.bd, www.primeuniversity.edu.bd